পরিচয়

দ্বিতীয় সমালোচনা সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭০

ভাদ্র সংখ্যা পরিচয় দ্বিতীয় সমালোচনা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সমালোচনা বিলম্বে পাওয়ায় এবং প্রস্তাবিত পৃষ্ঠা সংখ্যার মধ্যে তার স্থান সঙ্কুলান করতে অসমর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হল। অন্যথায় আরও মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য ছিল। বর্তমান অর্থ-নীতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করে আরও মূল্যবৃদ্ধি করা অপেক্ষা দ্বিতীয় আর একটি সমালোচনা সংখ্যা প্রকাশ করাই আমরা শ্রেয় বিবেচনা করলাম। আশা করি পাঠকেরা এবং লেখকবৃন্দ আমাদের এ-সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।

এই সংখ্যাটিও মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হবে। বিস্তারিত রচনা-সূচী অন্যত্র প্রকাশিত হল। আমরা আশা করি, পাঠকরা এই সংখ্যাটিও পূর্বাহ্নে সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

এই সংখ্যার মূল্যবৃদ্ধি করা হবে না।





আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সাথে চার চামচ মহা দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

পরিচয়
বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ২
ভাদ্র, ১৩৭০

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা
২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

নিশীথ কর

মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব

থার্মো-নিউক্লিয়ার যুগ। তায় সমাজতান্ত্রিক শিবির অনেক প্রসারিত ও শক্তিশালী। স্তালিন-যুগের সেই 'লেনিনজম'-এর দ্বন্দ্বগুলি হুবহু প্রয়োগ করে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারাগুলিকে যেন সঠিক বিশ্লেষণ করা যাচ্ছিল না। সোভিয়েত দেশের ২০তম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ তাই কতকগুলি মার্কস-লেনিনতত্ত্বের কালোপযোগী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছিলেন। পরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৭ সালের ১২ পার্টি ও ১৯৬০ সালের ৮১ পার্টির সিদ্ধান্তে সেই বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই 'মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব' বইখানি লিখিত।

বছর দুই পূর্বে বইখানি যখন মস্কো থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সেটি মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। পরে কিন্তু এই লেনিনতত্ত্ব নিয়েই বিরাট মতপার্থক্য প্রকট হয়ে পড়ে। ফলে এই বই-এর অনেক কিছু বিতর্কমূলক হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য এই মতপার্থক্যের দুটি প্রধান প্রবক্তা হল : রুশ ও চীন।

আজ মার্কসীয় তত্ত্বগুলি অতি সাধারণ লোকের কাছেও বিতর্কমূলক হয়ে উঠেছে। ফলে ভক্তিমার্গে মার্কসীয় অনুগমনের রেওয়াজে কিছুটা ঘাটতি পড়েছে। আর তাই সাধারণের মধ্যে যুক্তিমার্গে মার্কসবাদ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সেই নিরিখেই এই বইটির পুনর্বিচার বোধ হয় নিরর্থক হবে না।

তবে ইতিমধ্যে মতপার্থক্য যে মত-কলহের রূপ নিয়েছে তাতে এই

Fundamentals of Marxism=Leninism, Foreign Languages Publishing House, Moscow.

ভ্রাতৃকলহ শেষে ভ্রাতৃবিচ্ছেদে পরিণত হলে মার্কসীয় তর্কবিতর্কও দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠবে। সে আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু বইখানির ইংরাজি অনুবাদ সুখপাঠ্য বলে মনে হয়েছে। প্রায় নয় শত পৃষ্ঠায় লিখিত বইখানিতে সাম্প্রতিক কালের অনেক বিষয়ের অনেক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশে দার্শনিক আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: দার্শনিক বস্তুবাদ, ডায়ালেকটিক্‌স্‌ ও জ্ঞানতত্ত্ব। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইউরোপীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদী দর্শনের মধ্যে সংগ্রামের উল্লেখ করা হয়েছে। আর দেখান হয়েছে যে এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত শাসক ও শোষক শিবিরের সংগ্রাম। দুঃখের বিষয় এখানে এশিয়া দেশের কোনো দর্শনের আলোচনা নেই। এই অবজ্ঞা হয়তো আজকের মতপার্থক্যের অন্যতম কারণ! যাই হোক, আধুনিক কালের দর্শনালোচনায় 'এক্‌জিস্টেন্‌সিয়ালিজম', 'নব্য পজিটিভিজম', 'প্র্যাগ্‌মাটিজম' প্রভৃতি মতবাদ-উদ্ভবের যে সামাজিক কারণ তা নির্দেশ করা হয়েছে। দুটি সাম্রাজ্যবাদী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের নৃশংসতায় সাম্প্রতিক কালের দার্শনিকরা বহির্বিশ্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার পথ ধরে প্রচ্ছন্ন ভাববাদী দর্শনের মধ্যেই আশ্রয় নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই দর্শন দেখা যাচ্ছে ধনতন্ত্রের সমর্থক। আর প্র্যাগ্‌মাটিজমকে আমেরিকার বৃহৎ ব্যবসাদারদের দর্শন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের বুর্জোয়া দার্শনিকরা তাই আসলে প্রচ্ছন্ন ভাববাদী। সার্ত্রে বা কামু; রাসেল বা কার্নাপ বা আয়ার; ডিউয়ী বা উইলিয়াম জেমস—এঁরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে ধনতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু এ-সবের আলোচনা এত সারল্যাশ্রিত যে এ-সব দর্শনের সঙ্গে তার সামাজিক ভিত্তির যে সম্পর্ক তা সাধারণ পাঠকের কাছে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, আজকের জগতে এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা বস্তুবাদী না হয়েও বা ভাববাদী হয়েও সমাজতান্ত্রিক জগতের অনেক কিছুর সমর্থক বা ডায়ালেক্‌টিকস্‌ তত্ত্বের অনেক কিছু স্বীকার করে নেন। তাঁদের চিন্তার এই স্ববিরোধিতার সামাজিক কারণ নির্দেশ বা আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

তবে অন্যান্য দেশের বস্তুবাদী দার্শনিকরা ভাববাদী ও অন্যান্য দর্শনালোচনায় তার স্ববিরোধিতা ও সীমা নির্দেশ করেছেন। এঁদের দর্শন সম্বন্ধে কিন্তু কোনো আলোচনা নেই। শুধুই তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

এঁদের মধ্যে আছেন: আমেরিকার বারোজ ডানহাম, হাওয়ার্ড সেলসাম, হ্যারি ওয়েলস, জন সমারভিলি। ইংলণ্ডের জন লুইস, মরিস কর্নফোর্থ, আর্থার হেনরি রবার্টসন। ফ্রান্সের রজার গরদী, জিন কানাপা, মারিও স্পিলেমা, সিজারে লুপোরিনা প্রভৃতি।

ডায়ালেকটিক্‌সের আলোচনায় বস্তুজগতের আকারগুলিকে (ক্যাটিগোরিকে) বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে—তবে বহুক্ষেত্রেই তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় দেখান হয়েছে তত্ত্ব (থিয়োরি) ও প্রয়োগের (প্র্যাকটিসের) নিগূঢ় সম্বন্ধ। "প্রয়োগ ব্যতিরেকে তত্ত্ব হয় বন্ধ্যা এবং বিনা তত্ত্বের নির্দেশে প্রয়োগ হয় ব্যর্থ।" তবে শেষ পর্যন্ত কোনো তত্ত্বের সত্যতা বিচার করা যায় তার প্রয়োগের মাধ্যমেই। এই প্রয়োগতত্ত্বের আলোচনা আজকের দিনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকের মতপার্থক্যের হয়তো শেষ সমাধান হবে এই প্রয়োগের ভিত্তিতেই।

দ্বিতীয় অংশে ইতিহাসের আলোচনাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: মার্কসবাদী ঐতিহাসিক তত্ত্বের সারার্থ; শ্রেণী; শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা; ইতিহাসে ব্যক্তি ও জনতার ভূমিকা; সামাজিক প্রগতি। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক ইতিহাসে স্তালিনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। কারণ স্তালিন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের পুনঃপুনঃ মূল্যায়নের অন্ত নেই। আর স্তালিনকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্যেরও অন্ত নেই। এই বই-এ বলা হয়েছে ইতিহাসে নেতার ভূমিকা যদিও স্বীকৃত, তবুও সেই নেতার অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে অনেক দোষ থাকতে পারে। তাই ব্যক্তিপূজা মারাত্মক। স্তালিনের চরিত্রে বহু গুণ ছিল। যেমন, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অসাধারণ সংগঠনশক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান, লৌহদৃঢ় মনোবল, অনমনীয় সংগ্রামস্পৃহা। কিন্তু তাঁর চরিত্রে আবার কতগুলি দোষ ছিল। যেমন, দুর্বিনীত ব্যবহার, অপরের মতামত সম্পর্কে অসহিষ্ণু মনোভাব, সন্দেহপ্রবণতা, চাটুপ্রিয়তা ইত্যাদি। তাই স্তালিনের ব্যক্তিপূজার ফলে তাঁর চরিত্রের দোষগুলি সোভিয়েত সমাজের অনেক ক্ষতিসাধন করে, পার্টির গণতান্ত্রিকতা ব্যাহত হয়, আইন-লঙ্ঘন ঘটে, অহেতুক পীড়ন চলে এবং কিছু অযোগ্য লোক চাটুবৃত্তি দ্বারা নেতৃত্বের

আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। স্তালিনের ভূমিকা থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করা যায় যে ব্যক্তিপূজা সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের বিরোধী। (পৃঃ ২২৯)

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে শুধু স্তালিন-ব্যক্তিপূজার আলোচনা কেন ? লেনিন-ব্যক্তিপূজার আলোচনা করা হয় নি কেন ? অর্থাৎ সব ব্যক্তিপূজাই বন্ধ করার গণতান্ত্রিক পন্থা নির্দেশ করা হয় নি কেন ? অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে স্তালিন সম্বন্ধে ব্যক্তিপূজাকে নিন্দা করার উৎসাহ থাকলেও—আসলে ব্যক্তিপূজাকে বন্ধ করার আগ্রহ নেই। তাই বোধ হয় 'ব্যক্তিপূজার ঔচিত্য' নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে আজ মতপার্থক্য।

মার্কসবাদের আলোচনায় অর্থনীতি মূলকথা। তৃতীয় অংশে ধনতন্ত্রের অর্থনীতির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে : প্রাক-মনোপলি ধনতন্ত্র, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর—সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদ। শেষোক্ত আলোচনা আজকের জগতে বিশেষ মূল্যবান।

ধনতন্ত্রের অর্থনীতিকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখান হয়েছে যে ধনতন্ত্র যখন শুরুতে সামন্ততন্ত্রের শিকল ভেঙ্গে আবির্ভূত হল তখন তা প্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল। পরে কিন্তু সেই ধনতন্ত্রই যখন রূপান্তরিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে পৌছল তখন আবার তা সমাজের পায়েই শিকল পরাল। মনোপলি ধনতন্ত্রের দৌরাত্ম্যে নানা দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটে সমাজদেহ কণ্ঠকিত হল। পর পর দুটি যুদ্ধই এই সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের পরিণতি।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে কিছু রূপান্তর ঘটান হল। এই রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য হল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। পূর্ব সঙ্কটের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান অর্থনীতিকে সঙ্কটমুক্ত করার জন্য রাষ্ট্র মনোপলি ধনতন্ত্রকে নানা ভাবে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। ফলে দ্বিতীয় যুদ্ধের পর প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে বর্তমান ধনতন্ত্রের রূপ নিল "রাষ্ট্রসর্বস্ব মনোপলি ধনতন্ত্রবাদ" (State-monopoly Capitalism)।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে অবশ্য ধনতন্ত্র কিছুটা নিয়মিত হল। এ কথাও সত্য যে তেমন কোনো গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটও দ্বিতীয় যুদ্ধের পর দেখা দেয় নি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে (যেমন, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানি, ইংলণ্ড প্রগতিও সম্পূর্ণ শিথিল হয় নি। কিন্‌সীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে বেকার সমস্যা এড়াবার প্রচেষ্টাও কিছুটা সফল হয়েছে। শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে এবং ট্রেড ইউনিয়নেরও শক্তি বেড়েছে।

এই সব পরিবর্তনের ফলে আজকের দক্ষিণপন্থী সোসাল ডেমোক্রাটরা, বৃটিশ লেবার পার্টির কিছু নেতা (যেমন, জন স্ট্র্যাচি) এবং আমাদের দেশে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত বলতে শুরু করেছেন যে মার্কসবাদ বরবাদ হয়ে গেছে। রাষ্ট্র এখন শ্রেণীসংগ্রামের উর্ধ্বে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত মনোপলি ধনতন্ত্রই ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রবাদে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে "সর্বজনীন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র" বলে আর সাম্রাজ্যবাদকে প্রচার করা হচ্ছে "জনগণের ধনতন্ত্রবাদ" বলে।

এতে কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সাময়িক পরিবর্তন যা ঘটেছে তা অস্বীকার করে লাভ নেই—কিন্তু সে পরিবর্তনও যে সোভিয়েত অর্থনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল—তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ সাময়িক সাফল্য সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের দুরারোগ্য রোগের লক্ষণ কিন্তু পরিস্ফুট। এই বই-এ দেখান হয়েছে যে খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে তিনবার সঙ্কট বা মন্দা (যাকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বলেছে "রিসেসন") দেখা দিয়েছে। (পৃঃ ৩৪৩) সরকারী হিসাব অনুযায়ী আমেরিকায় বেকারকাহিনীও ক্রমবর্ধমান—১৯৫৯ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ। (পৃঃ ৩৪৩) তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক শোষণ ও যুদ্ধসজ্জার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই অস্ত্রসজ্জার খতিয়ানে এত বিশাল পরিমাণ পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে যে উদ্বৃত্ত পুঁজির সমস্যা উঠতে পারছে না। কিন্তু দুনিয়ায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়ে অস্ত্রসজ্জার পরিমাণ কমলে এবং ঔপনিবেশিক শোষণের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে গুরুতর সঙ্কট দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, যতদিন না উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান ঘটছে ততদিন শ্রেণীসংঘর্ষ বা সঙ্কটের হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়া সম্ভবপর হবে না। উপরন্তু দেখা যায় 'রাষ্ট্রায়ত্ত মনোপলি ধনতন্ত্রবাদ' রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঠেলে না দিয়ে—বরং মনোপলি ধনতন্ত্রবাদীরাই রাষ্ট্রকে ধনতন্ত্রবাদের স্বার্থেই পরিচালিত করছে। তাই বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রসর্বস্ব মনোপলি ধনতন্ত্রবাদ এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার ফলে শুধু শ্রমিক কৃষক নয়, নতুন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীও" (বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মী, হিসাবরক্ষক, শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী, অফিস কর্মচারি, বাণিজ্য ও প্রচার ব্যবস্থার কর্মী প্রভৃতি) শ্রমিকশ্রেণীর মিত্ররূপে আবির্ভূত হচ্ছে। বুর্জোয়া

শ্রেণীর মধ্যেও স্তরবিভাগ এমন পর্যায়ে পৌছেচে যে মুষ্টিমেয় মনোপলি ধনতন্ত্রবাদীদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যাপক মোর্চা গঠনের সম্ভাবনা বর্তমানে ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই ধরনের যুক্ত-মোর্চার পথকেও কেন্দ্র করে মতপার্থক্য আছে। অর্থাৎ এ পথ রিফর্মের বা শোধনবাদীদের পথ ; বিপ্লবের পথ নয়।

সাম্প্রতিক পথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চতুর্থ অংশে করা হয়েছে। এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব ও কৌশলের যে-আলোচনা করা হয়েছে তা বর্তমান মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই কমিউনিস্ট কৌশলের অর্থ কিন্তু ফন্দি বা ফিকির নয়। ফন্দি বা ফিকির ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কমিউনিস্টরা তাদের লক্ষ্যে পৌছবার কৌশল বা পথটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার নৈতিক সাহস রাখে—তা সে-পথ রক্তক্ষয়ীই হোক বা শান্তিপূর্ণই হোক। সাম্রাজ্যবাদীরা কিন্তু তাদের কৌশল বা অভিসন্ধি খোলাখুলি প্রকাশ করে না।

উপস্থিত এই কৌশলটি নিয়েই কমিউনিস্ট দুনিয়ায় বিশেষ মতপার্থক্য: মার্কসবাদ মানবতাবিবর্জিত হবে, না মার্কসবাদ মানবতাসম্মত পথ গ্রহণ করবে, এই হল মূল কথা। এটম শক্তির উদ্ভবের পর যুদ্ধের রূপ গেছে বদলে। থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ এখন বিশ্বধ্বংসী। কিন্তু এই ধ্বংসকে স্বীকার করেও সমাজতন্ত্রে পৌছতে হবে? না, বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধকে এড়িয়ে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও প্রতিযোগিতার পথে সাম্যবাদী লক্ষ্যে পৌছানর চেষ্টা করতে হবে? কারণ: "Communists firm conviction that in our time a war will inevitably plunge humanity into an abyss of tremendous sufferings and will for a long time impede its social, economic and cultural progress"। (পৃঃ ৫৭৪) তাছাড়া, একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা শুধু হিংসানীতিরই অনুগামী নয়—তারা পারতপক্ষে অহিংস নীতিরই সমর্থক। তবে অতীতে তারা বাধ্য হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে—কিন্তু আজ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির ফলে অস্ত্রহীন বিপ্লব সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এ সব কথা শুধুই সম্ভবপর

বা hypothetical। ভবিষ্যৎ দুনিয়াই প্রমাণ করবে কমিউনিস্টরা কোন্ পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই hypothesisও এক দল মার্কসবাদী মানতে রাজী নয়। তাদের পক্ষে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বা সহ-অবস্থান সম্ভবপর নয়।

কমিউনিস্ট কৌশলের প্রধান কথা অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার্জন। এই ক্ষমতা রুশ দেশে অক্টোবর (১৯১৭) বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণী প্রথম লাভ করে। কিন্তু এই বই-এ দেখান হয়েছে যে সেই বিপ্লবেও লেনিন শান্তিপূর্ণ পথ গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরে কিন্তু বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীই সেই বিপ্লবকে রক্তক্ষয়ী করে তুলতে বাধ্য করে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে একাধিক রাষ্ট্র একাধিক পথ গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংযুক্ত ফ্রন্টের উদ্যোগ।

পরবর্তী যুদ্ধোত্তর যুগের প্রধান কথা হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সম্প্রসারণ। শুধু তাই নয়, এ যুগের আর একটি নতুন পরিস্থিতি হল পুরাতন উপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন এবং তা থেকে কতকগুলি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে এই রাষ্ট্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) যে দেশগুলি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে (যেমন, চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম)

(২) যে দেশগুলি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে (যেমন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, ক্যাম্বোডিয়া, সিংহল, ইরাক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সুদান, টিউনিসিয়া, মরোক্কো, লিবিয়া প্রভৃতি)

(৩) যে দেশগুলি স্বাধীনতা লাভের পরেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক এবং অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাকে সীমিত করছে (যেমন, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ)।

এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছেড়ে দিলে—দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও অনেকাংশে প্রগতিশীল। এই সমস্ত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নীতির মধ্যে

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তারা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতা কমাতে উৎসুক। একথা সত্য এ সব দেশে অত্যন্ত সীমিত ভূমিসংস্কার করা হয়েছে। তবে শিল্পোৎপাদন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও বেড়েছে। অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। অবশ্য একথা ঠিক যে অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীই স্বাধীনতা লাভের পর সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। তবুও এই সমস্ত দেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে অন্যান্য শ্রেণীরও নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথও উন্মুক্ত হচ্ছে। আর একটি কথা এই সব দেশের রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার (State Capitalism) প্রসার দেখে যেন ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রসর্বস্ব মনোপলি ধনতন্ত্রবাদের (State Monopoly-Capitalism) সঙ্গে তার সমগোত্রীয় সাদৃশ্যই দেখানো না হয়। কারণ মনে রাখতে হবে যে প্রাচ্যের দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। (পৃঃ ৫১১)

প্রাচ্যের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কাটাবার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য তাই রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া, ভারত ও ব্রহ্মে সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্যের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এ সমাজতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ থেকে অনেক দূরে থাকলেও, জনগণের চাপে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যে সমাজতন্ত্রবাদকে লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে এটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর আর একটি অংশের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতার কথাও ভুললে চলবে না। এরা একদিকে যেমন রাষ্ট্রকে শুধু তাদের ধনতান্ত্রিক স্বার্থে পরিচালনা করতে উৎসুক; তেমনি অন্যদিকে বিদেশী মূলধনের সঙ্গে আপসের জন্যও উৎসুক। আবার সাম্রাজ্যবাদীরাও নতুন ফন্দী এঁটে এখন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে মিত্রতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এরা এমনকি অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের সুবিধারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তবে এরা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্পবিকাশের বিরোধী। এরা এখন দেশী-বিদেশী "মিশ্র" শিল্পসংস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ

উদ্যোগী। তাছাড়া আছে এদের সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ। সর্বোপরি আছে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা।

শেষোক্ত প্রবণতার বিচার করলে মতপার্থক্য বোধ হয় স্বাভাবিক। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন উপনিবেশগুলি ছাড়া, বাকিগুলি প্রগতিশীল নয়। এই দেশগুলি নয়া উপনিবেশবাদের শিকলে বাঁধা পুরনো সাম্রাজ্যবাদেরই অপ্রত্যক্ষ ঘাঁটি। সুতরাং এই স্বাধীন উপনিবেশগুলির আশু কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

শেষাংশের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যে আলোচনা তা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ মার্কসতত্ত্বের যে লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমে পৌছান তারই নানা সমস্যা নিয়ে এই অংশের আলোচনা। আর সেই আলোচনার মূল উপাদান করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা।

স্বভাবতই 'প্রলিটারিয়ান ডেমোক্রাসি'কে আদর্শ ডেমোক্রাসি বলে ধরতে হবে। কারণ তা শ্রেণীদ্বন্দ্ববিবর্জিত কিন্তু তা আয়াসলভ্য। তাকে 'প্রলি-টারিয়ান ডিক্টেটরশিপে'র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যতদিন বুর্জোয়া শ্রেণী বা তার প্রভাব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে টিঁকে থাকবে ততদিনই এই 'ডিক্টেটরশিপ' চলবে। বুর্জোয়াবিরোধী এই ডিক্টেটরশিপের নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই ডিক্টেটরশিপের নামে যখন অনেক অগণতান্ত্রিক ব্যাপার জনগণের উপরও চাপানো হয়, তখন এর সমালোচনা প্রয়োজন। কারণ এই ডিক্টেটরশিপ যখন রাষ্ট্রের পক্ষে কার্যকরী করা হয় নিরঙ্কুশ এক পার্টি-নায়কতার মাধ্যমে এবং সেই পার্টির ভিত্তি যখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা— তখন ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা গেছে যে রাষ্ট্র ডেমোক্রেসিকে সুরক্ষিত না করে জনগণের উপর ডিক্টেটরশিপেরই দাপট চালিয়েছে। এতে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করলেও কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে লেনিন বা বিশেষত স্তালিনের শাসনকালে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার নজিরের উল্লেখ বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। তবে অতীতে তার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা যদিই বা থাকে, বর্তমানে এই গণতান্ত্রিকতার সম্প্রসারণ কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? অর্থাৎ অতীতে যাই ঘটুক বর্তমানে লেনিন-প্রবর্তিত পার্টি-কাঠামো বা রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে যদি গণতান্ত্রিক পরিবর্তন না আনা যায়, তাহলে তাকে আদর্শস্থানীয়

গণতন্ত্র বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হবে। সম্প্রতি আবার সোভিয়েত দেশের ২২তম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছে যে সে-দেশ শ্রেণীবিবর্জিত হওয়ায় সেখানে নাকি এই ডিক্টেটরশিপ অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু যখন রাষ্ট্র-কাঠামো বা পার্টি-কাঠামোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক পরিবর্তন দেখা গেল না এবং যেখানে ক্রুশ্চেভের একনায়কত্বের দাপট আজও অব্যাহত সেখানে শুধুই কথার কথা হিসাবে প্রলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ উড়িয়ে দিলেই যে সেটা উড়ে গেল, একথাও তো বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়।

এখানে এইটুকু শুধু উল্লেখযোগ্য যে যাঁরা সোভিয়েত মতের সঙ্গে একমত নন তাঁরা বলছেন যে সোভিয়েত দেশে এখনও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব নাকি বর্তমান। আর সেই কারণে প্রলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপও সেখানে উধাও হতে পারে না বা আজও তা হয় নি।

কিন্তু গণতন্ত্রের প্রশ্ন বাদ দিলে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে তা পড়লে কিছু নতুন জ্ঞান লাভ হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে অভূতপূর্ব দ্রুত অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা লক্ষণীয়। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে দেশকালভেদে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের তারতম্য হয়। "The duration of the transition period from capitalism to socialism is bound to vary in different countries. Much depends here on internal and international conditions।" (পৃঃ ৬৯৩) শুধু তাই নয়, একথাও মনে রাখতে হবে যে: "there should be no skipping essential phases, no undue haste. Unjustified haste in building socialism is harmful।" (পৃঃ ৬৯৩) কিন্তু তা বলে মনে করলে চলবে না যে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। সর্বত্রই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেই সংঘটিত করতে হয়।

এ ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো এখানে কোনো অসম সম্পর্ক থাকে না বলে শোনা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই নীতিরও ব্যতিক্রম হয়েছিল বলে শোনা

গেছে! সে যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা এবং অনুন্নত এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিকেও উন্নত করার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করা।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে অর্থনীতিই মূল কথা হলেও—তাকে কেন্দ্র করে যে নানামুখী সামাজিক রূপ-পরিবর্তন হতে থাকে সেটাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিনব অবদান বলা যেতে পারে। সোভিয়েত দেশে এ পরিবর্তন কিছুটা লক্ষণীয়। সেখানে পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী বর্তমান। শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্থক্য অনেক হ্রাস হলেও সম্পূর্ণ চলে যায় নি। নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রভেদ দূরীভূত হয় নি। তবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছে এবং সংস্কৃতির ব্যাপ্তিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অবিংসবাদিত-ভাবেই অগ্রগতি ঘটেছে। তবে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে পরিবর্তন আশা করা গিয়েছিল তা আজও কিন্তু ঘটে নি। মানব-কেন্দ্রিক সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে সভ্যতার মাপকাঠি বোধ হয় মানুষের এই নৈতিক সম্বন্ধের উন্নতি। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বীকার করা হয়েছে যে স্বল্প সময়ে এ মানবিক রূপান্তর ঘটে ওঠে নি: "It is understandable that in the course of a few decades it is impossible fully to eriadicate all the conceptions and habits which struck deep root during the domination of private property for thousands of years. Various traits of old morality and way of life still survive in the minds of some members of socialist society: a dishonest attitude to work, money-grabbing, selfishness, nationalistic prejudices, a wrong attitude to women, drunken-ness and anti-social views which at times lead to hooliganism and crime।" (পৃঃ ৭৫৮) তবে এই সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে: "We speak of all such phenomena as being survivals of capitalism. Thereby we also stress that these phenomena are alien to socialism and that in themselves social relations in socialist society, far from producing such ugly phenomena, on the contrary, gradually must oust them।" (পৃঃ ৭৫৮)

আশা করা যাক বহু আকাঙ্ক্ষিত কমিউনিস্ট সমাজে এসব কলহ দূরীভূত হবে। সেই সমাজের একখানি সুন্দর ছবি এই বই-এ আঁকা হয়েছে। শ্রেণীসমাজের সব ভেদাভেদ, সব বৈষম্য সেখানে অপসারিত। এমনকি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও সেখানে অবলুপ্ত। সেই প্রথম প্রত্যেক মানুষ সেখানে নিজের আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রত্যেক মানুষ অধিকার-ভেদে যার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী (according to his ability) কাজ করবে—আর তার পরিবর্তে তার প্রয়োজন অনুযায়ী (according to his needs) তার শ্রমের মূল্য গ্রহণ করবে। অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সমাজে উৎপাদনের যে প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে তারই ভিত্তিতে এই সাম্যবাদী স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা হবে। বহু যুগের বহু মানুষের স্বপ্ন তখন সার্থক হবে!

কিন্তু সে দিন সুদূরপরাহত নয়। সোভিয়েত দেশে সাম্যবাদী সমাজের দিকে যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর আনুষঙ্গিক বৈষম্যগুলির ক্রমাপসরণ কেন যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না, সেই প্রশ্নই মনে থেকে যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে "কমিউনিস্ট সমাজ" সৃষ্টির আর একটি "এক্সপেরিমেণ্ট" চলেছে। শুধু উৎপাদনের প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই নয়—অনগ্রসর অর্থনৈতিক ভিত্তিতেও নাকি কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একথাও যাঁরা বলছেন তাঁরাও অবশ্য মার্কসবাদী, একথা কিন্তু ভুললে চলবে না।

সুতরাং মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী কে এবং মার্কসবাদী কে নয়?—এই প্রশ্নই বইখানি পড়তে পড়তে বারংবার মনে হয়েছে। আর স্মরণে এসেছে এঙ্গেলস-উল্লিখিত মার্কসের সেই কথা: "All I know is that I am not a Marxist."

সুতরাং সাম্প্রতিক মতপার্থক্যের কবর দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক নতুন মার্কসবাদ রচনা করা কি চলে না?

সুকুমার মিত্র

লাফার্গ দম্পতি

কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী ও বিপ্লব-সাধক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স্-এর চারিদিকে যে কয়টি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সমাবেশ ঘটেছিল পল লাফার্গ তাঁদের অন্যতম। বিদুষী মার্কস-দুহিতারাও কেবলমাত্র মার্কস ও এঙ্গেলস-এর স্নেহধন্যাই ছিলেন না, তাঁদের কর্মজীবনের সাথীও ছিলেন। স্বভাবতই মার্কস-দুহিতারা প্রতিভাশালী তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং যাঁরা মার্কস-কন্যাদের পাণিগ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুইজন ছিলেন ফরাসী লুঁদেৎ ও লাফার্গ এবং একজন ইংরেজ এ্যাভেলিং। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এঁদের সকলের নামই উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে।

এদেশে যাঁরা প্রথম মার্কসবাদী আন্দোলনে লিপ্ত হন তাঁরা মার্কস, এঙ্গেলস, লাফার্গ প্রভৃতি মনীষীদের রচনাবলীর সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এঁদের রচনাবলীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। লাফার্গের লেখা 'ইভোলিউশন অব প্রপার্টি' নামক বিখ্যাত (মূল ফরাসী) গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ধনদৌলতের রূপান্তর' নামে অধ্যাপক সরকারই প্রথম প্রকাশ করেন, বোধ হয় ১৯২৪।২৫ সালে। তারপর আমরা ইংরাজীতে মার্কস এঙ্গেলস প্রভৃতির রচনাবলী পাঠকালে কখনও কখনও লাফার্গের উল্লেখ দেখেছি, জেনেছি তিনি এঙ্গেলস-এর কোনো কোনো রচনা অনুবাদ করেছিলেন, মার্কস সম্বন্ধে লাফার্গের লেখাও আমরা পড়েছি, আর জেনেছি মাদাম ক্রুপস্কায়ার রচিত 'লেনিনের স্মৃতিকথা' থেকে লাফার্গ দম্পতির আত্মমৃত্যু বরনের কাহিনী। এর বেশি লাফার্গ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত ফ্রেডারিক

করেসপণ্ডেন্স—ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পল এ্যাণ্ড লরা লাফার্গ। প্রথম খণ্ড (১৮৬৮—১৮৮৬) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৭—১৮৯০), মস্কো।

এঙ্গেলস এবং পল লাফার্গ ও লরা লাফার্গের পত্রাবলীর ছুটি খণ্ড যখন এদেশে এসে পৌছল তখন আমরা নতুন করে জানলাম ও চিনলাম পল লাফার্গ এবং তাঁর জীবনসঙ্গিনী লরাকে। এক আশ্চর্য উজ্জল মনীষা যার হীরকদ্যুতি দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি পত্রে! এই বিপুলায়তন ছুই খণ্ডের পত্রাবলীতে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পল লাফার্গ ও লরা লাফার্গের ব্যক্তিগত জীবন একান্ত অন্তরঙ্গভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আমাদের সামনে। আর শুধু তাই নয়। এই পত্রাবলীতে উন্মোচিত হয়েছে উনিশ শতকের শেষ দিকের ইওরোপের ইতিহাসের দৃশ্যপটগুলি। খ্যাতনামা রাষ্ট্র ধুরন্ধর, সমাজবাদী নেতা, ছোট বড় আরও বহু মানুষের অংশগ্রহণে যে দৃশ্যপটগুলি বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাসের পটভূমিতেই প্রথম আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ, বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া উজ্জলভাবে ফুটে উঠেছে এই পত্রাবলীতে। এক কথায় এই পত্রাবলী শুধু এঙ্গেলস ও লাফার্গ দম্পতির ব্যক্তিগত পত্রাবলী না, এই পত্রাবলী ইওরোপের ইতিহাসের একটি যুগের (প্রথম আন্তর্জাতিকের ইতিহাসসহ) আকর-গ্রন্থ।

নিছক ব্যক্তি-জীবনের যে চিত্রটি এঙ্গেলস-লাফার্গ পত্রাবলীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা হাসি-কান্নায় ভরা এক মধুর চিত্র। পিতৃপ্রতিম এঙ্গেল্স তাঁর কন্যা-সমা লরা এবং জামাতাস্থানীয় সহকর্মী পলকে সাহায্য করার জন্যে সদা মুক্তহস্ত, পল ও লরার চিঠির পর চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে টাকার তাগিদ দিতে কখনও ভুল হয় না, আর ভুল হয় না এঙ্গেলস-এর টাকা পাঠাতে। সংসারের কুটিল চক্র পল কখনই বুঝে উঠতে পারেন নি, তাই কখনও তিনি ডাক্তার, কখনও ফটো-এনগ্রেভার, কখনও ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কার, কখনও সাংবাদিক বা চাকরীজীবী—কিন্তু অর্থভাগ্য তাঁর ছিল না। লোকে ঠকিয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে, আর নতুন নতুন পেশা অবলম্বন করে স্বচ্ছল জীবনযাত্রার দিবাস্বপ্নে মশগুল লাফার্গ প্রতিবারই প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে যখন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন তখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" এই অবস্থা। তবু ভাবনা নেই, কারণ এঙ্গেলস আছেন, সন্তান-স্নেহাতুর মুক্ত হৃদয় এঙ্গেলস।

এঙ্গেলস-এর চরিত্রের সঙ্গে লাফার্গের চরিত্রের কিছুটা মিল আছে। ছুজনেই বেপরোয়া, পর্যটনে, পানোৎসবে, আনন্দোল্লাসে ছুজনেই উদার, দিলদরিয়া।

লরার সঙ্গে বিয়ে স্থির হবার পর লাফার্গ এঙ্গেলসকে চিঠি লিখছেন:

শ্যাম্পেনের বোতলগুলির মহান্ শিরশ্ছেদকারী। এল এবং অন্যান্য ভেজাল-দেওয়া বাজে জিনিসের অতলস্পর্শ গলাধঃকরণকারী স্প্যানিয়ার্ডদের সম্পাদকের প্রতি অভিনন্দন: পানোৎসবের দেবতা যেন আপনার উপর দৃষ্টি রাখেন।

সমস্ত ছুনিয়ার সঙ্গে আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, মেডিকেল ছাত্র, কুমার মিঃ লাফার্গ "অধিবিদ্যার মুক্তারাজির মাল্য রচনাকারিণী" কুমারী জে. লরা মার্কসকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। আর এই বিয়ে খুব আগে হলে এপ্রিল মাসে হতে চলেছে। এর আগে কখনও কেউ ট্যান্টালাসের অবস্থায় পড়তে চেয়েছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ, এই এপ্রিল মাসটা চাঁদের আলোয় ঠাণ্ডা লাগার অথবা দিনের বেলায় 'হঠাৎ প্রেমে পড়ার' (এখানে যে ফরাসী বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ 'সর্দিগরমি'ও হয়—লেখক) পক্ষে চমৎকার মাস। (২নং চিঠি, ১৮৬৮, ১৮ই মার্চ)

বিয়ের পর লেখা আরও অনেক চিঠিই এমনই হাস্য-পরিহাসে উজ্জল। বর্ণনার ভঙ্গি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, শাণিত বিদ্রূপ চিঠিগুলিকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এ ক্ষেত্রে লরাও স্বামীর উপযুক্ত জুড়ি।

লাফার্গ, গুয়েসদে প্রভৃতি নেতারা উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে লোককে লুটপাট করতে প্ররোচিত করছেন এই অভিযোগে ফরাসী সরকার মামলা আনার পর যে সকল ঘটনা ঘটে সেগুলির বিবরণ লাফার্গ ও লরার চিঠিগুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জেল হয়েছে লাফার্গ ও গুয়েসদের। লাফার্গের চিঠিতে দেখা যায় ছুই বন্ধু জেলে যাওয়ার আগে জেল পরিদর্শনে গেলেন। (উনিশ শতকের এই ইওরোপ আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে—লেখক) জেলের গভর্ণর গুয়েসদেকে দেখে বিব্রত, লজ্জিত। গুয়েসদের কাছেই তিনি প্রথম রাজনীতির পাঠ নিয়েছিলেন, এখন কিনা নিজের গুরুকেই তিনি জেলে আটক রাখবেন। লজ্জিত ছাত্র বিনয়-সহকারে ছুজনকেই জেলের ভিতরে ঢুকে সব চেয়ে ভালো ঘর বেছে রেখে যেতে অনুরোধ করলেন। ঘর বাছা হল, বন্দীরা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন গভর্ণর তার ব্যবস্থা করলেন। বন্দীরা নিজেদের আসবাবপত্র নিয়ে আসার অনুমতি পেলেন। বেলা ১০টা থেকে থেকে ৪টা পর্যন্ত লোকজন বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। লরা রোজ জেলের মধ্যে যাবেন এবং স্বামী ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সারবেন এ ব্যবস্থাও হল। (চিঠি নং ৭৪)।

এর পরেই লরা লিখেছেন এঙ্গেলসকে যে বন্দীরা ভালোই আছে। তাঁর কাজ হল রোজ তরিতরকারী মাংস মাছ ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া এবং সেই সুযোগে ভোজনোৎসব জমিয়ে তোলার জন্য ছোট এক বোতল ব্রাণ্ডি পাচার করা।

লাফার্গ লিখছেন (লাফার্গ ভোজনরসিকও বটে) গোল বেধেছিল গলদা চিংড়ি নিয়ে। বড় বড় দাঁড়া, জমকালো খোলা, চেহারাটা সত্যিই রাজকীয়। এমন জিনিস বন্দীদের জন্য দেওয়া নিষিদ্ধ। গভর্ণর বুদ্ধিমান লোক। তিনি ফতোয়া দিলেন চিংড়ির খোলা ছাড়িয়ে ফেল। তাহলেই চিংড়ির আভিজাত্য থাকল না। তখন তাকে আর বিলাসীর খাদ্য বলা চলে না। এইভাবেই গলদা চিংড়ি সাজসজ্জা-বিরহিত হয়ে জেলে ঢুকবার অনুমতি পেল। এর পর লাফার্গের নানাবিধ মাংসের জন্য একটি হাস্যরসপূর্ণ আবেদন। ব্যক্তিজীবনের এমন নানা ধরনের হাস্যমধুর চিত্র চিঠিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এসব ছাড়াও আছে সংগঠনের কথা, রাজনীতির কথা, সাহিত্যের কথা এবং আরো অনেক কিছু। বেদনার স্পর্শও লেগেছে কোন কোন চিঠিতে। যে-ইংল্যাণ্ডে তাঁরা জন্মেছিলেন, মানুষ হয়েছিলেন সেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি লরার ভালবাসাও ফুটে উঠেছে দু-একটি চিঠিতে। ১৮৮৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের চিঠিতে লরা লিখেছেন :

My heart is in England (my heart is not here)
With her brown kippered herrings and bland Pilsner beer!

এঙ্গেলস-এর কাছে মাফ চেয়েছেন কবিতায় বার্ণস-এর ছায়া পড়েছে বলে।

মর্মান্তিক বেদনাময় চিঠি আছে একটি। এঙ্গেলস-এর কঠিন পীড়ার সংবাদে ব্যাকুল লরার চিঠি। এই চিঠিটিতে সন্তানহারা মায়ের ছবিটিও ফুটে উঠেছে কয়েকটি লাইনের মধ্যে। স্পেনে থাকার সময় লরা তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তানকে হারিয়ে ছিলেন। কলেরা রোগে মারা গিয়েছিল ছেলেটি ঠিক সময় ওষুধের অভাবে। এঙ্গেলস-এরও কি তাই হবে? সময়মত ওষুধ যদি তিনি না পান? লিখতে লিখতে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল লরার চোখ থেকে ঝরে পড়ে বড় বড় ফোঁটা চিঠিটিকে ভিজিয়ে দিল। পিতৃপ্রতিম এঙ্গেলসকে হারানোর ভয়ে ব্যাকুল লরা এ চিঠিতে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন সন্তানহারা জননী ও স্নেহাতুরা কন্যারূপে।

কার্ল মার্কস-এর শেষ জীবনের কিছু খবরও প্রথম খণ্ডের চিঠিগুলিতে পাওয়া যাবে। এই সমস্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের কথা পরিমাণের দিক থেকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়গুলির তুলনায় অনেক কম।

স্পেনে প্রথম আন্তর্জাতিকের সংগঠকরূপে পল লাফার্গকে আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পত্রে দেখতে পাই। ছদ্মবেশে সীমান্ত অতিক্রম করে স্পেনে উপস্থিত হয়েছিলেন লাফার্গ এবং এঙ্গেলস-এর নির্দেশ অনুযায়ী সুচারুরূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। ইওরোপে প্রথমআন্তর্জাতিকের সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার, বিভিন্ন দল, উপদল ও রাজনৈতিক নেতাদের উক্তি, রচনা ও কর্মের বিচার, কর্মনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে লাফার্গ ও এঙ্গেলস-এর পত্রাবলী এক বিস্ময়কর তথ্যের খনি। লরা লাফার্গও তাঁর স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনীরূপে বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানত ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও স্পেন এই পত্রাবলীর আলোচনার ক্ষেত্র, অন্যান্য দেশও বাদ যায় নি। এই সকল আলোচনায় ইতিহাসের অনেক নেপথ্য দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে যা সাধারণত ইতিহাসগুলিতে পাওয়া যায় না।

১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে কলেরা মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং রথস্‌চাইল্ড গ্রুপ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ফাটকাবাজরা কলেরার মওকায় 'নাফা' করতে ছাড়ে নি এ-খবর পাওয়া যাবে লাফার্গের একটি চিত্তাকর্ষক পত্রে। (নং ১১৭)

১৮৮৫ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট আতঙ্কে বিহ্বল ফরাসী সরকার লালঝাণ্ডা ওড়ানো বন্ধ রাখার অজুহাতে শ্রমিক মিছিলের উপর গুলী চালিয়ে চার জনকে (২৪শে মে) হত্যা করে। এই মে মাসেই ভিক্তর হুগোর মৃত্যু হয়। বুর্জোয়াদের হুগো-প্রীতির মূল কারণ দেখিয়ে লাফার্গ যে সকল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন তাঁর চিঠিতে তার কারণ একান্তভাবেই রাজনৈতিক। (পত্র নং ১৫৪ ও ১৫৫।) হুগো ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং তাঁর শোক-মিছিল উপলক্ষে ধনিকশ্রেণী শ্রমিক মিছিলের পাল্টা জবাব দিতে চেয়েছিল।

এ সময় লাফার্গ জেলে ছিলেন। তাঁর মুক্তিলাভ বুর্জোয়াদের সমাজতন্ত্রী হয়ে যাওয়ার ফল বলে যে ভুল ব্যাখ্যা লাফার্গ দিয়েছিলেন এঙ্গেলস তা দেখিয়ে দিয়েছেন ২০১ নং চিঠিতে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই চিঠিটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির মধ্যেও যে পার্থক্য

থাকে এবং বুর্জোয়া কর্মনীতিতে সেই পার্থক্য যে প্রতিফলিত হয় এটা এঙ্গেলস পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাউট্‌স্কি, বের্নস্টাইন, হাইণ্ডম্যান, লিয়েবনাখ্‌ট্‌, বেবেল এবং আরো অনেকের চেহারা। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে ১৮৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা পল লাফার্গের চিঠিতে। এ সময় এঙ্গেলস সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছেন। লরার কাছে লেখা ১লা ডিসেম্বরের চিঠিতে এঙ্গেলস নিজের সত্তর বৎসর পূর্তির কথা জানিয়েছেন আর দিয়েছেন বার্ধক্যের ইঙ্গিত, নিজের এবং বেবেল, লিয়েবনাখ্‌ট্‌ প্রভৃতি সহকর্মীদের। অক্লান্ত যোদ্ধার জীবন শেষ হয়ে আসছে, তবু তাঁর কর্মের বিরাম নেই।

১৮৯৫ সালের ৫ই অগস্ট এঙ্গেলস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পরে আরও চিঠিপত্র লেখালেখি লাফার্গ দম্পতির হয়েছিল। সেগুলি ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

লাফার্গ দম্পতি বেঁচেছিলেন ১৯১১ পর্যন্ত। জীবনের প্রতি এত ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত এমন আদর্শ নিষ্ঠা ও নিরলস কর্মপরায়ণতা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায় লাফার্গ দম্পতি জীবনকে প্রতি মুহূর্তে নানা বর্ণে রসে উপভোগ করে চলেছেন সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়। জীবনের প্রতি এত বলিষ্ঠ ভালোবাসা ছিল বলেই জীবন-লীলায় যখন আর তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা ফুরিয়ে এল বলে তাঁদের মনে হল তখন একান্ত অনায়াসে ও অবহেলায় তাঁরা আত্মমৃত্যু বরন করলেন। আমাদের দেশে গীতা মুখস্থ করে যাঁরা হেদিয়ে যান অথবা গীতার কথা বলে ভারতীয় সভ্যতার বড়াই করেন তাঁদের মধ্যে জীর্ণ বস্ত্রের মতো এই দেহত্যাগের ক্ষমতা 'কোটিকে গোটিকে'রও আছে কিনা সন্দেহ!

লাফার্গের প্রতি লেনিন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ১৯১০ সালে প্যারিসে থাকার সময় লেনিন ও তাঁর স্ত্রী লাফার্গ দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে লাফার্গ দম্পতি আত্মমৃত্যু বরণ করেন। এ খবর লেনিনের কাছে পৌছালে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বলেন, "যদি কেউ আর পার্টির জন্যে কাজ করে উঠতে না পারে তাহলে, তাকে সোজাসুজি সত্যের মোকাবিলা করতে হবে এবং লাফার্গ দম্পতির মতোই মরতে হবে।"

লাফার্গ দ ‍্পতির শেষকৃত্যানুষ্ঠানে লেনিন গভীর আবেগের সঙ্গে ভাষণ দিয়েছিলেন।

লাফার্গ দম্পতি ও এঙ্গেলস-এর পত্রাবলী সম্পাদনে ও অনুবাদে মস্কোর বিদেশী ভাষা প্রকাশনা ভবন যত্ন ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু একটি অভিযোগ থেকে যায়। সেটি হল লাফার্গ দম্পতির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর অভাব। হয়তো তৃতীয় খণ্ডে এই অভাব পূরণ করা হবে, তবে.মনে হয় প্রথম খণ্ডেই জীবনী দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আমরা তৃতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করব। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী শ্রমিক কংগ্রেসের সংগঠনী কমিটির রিপোর্টের প্রচ্ছদপটের প্রতিলিপি এবং কার্ল মার্কস-এর বংশতালিকা সংযুক্ত হয়েছে।

এঙ্গেলস-লাফার্গ পত্রাবলী প্যারিস থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফরাসী সংস্করণ থেকেই বর্তমান খণ্ডগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ডে এঙ্গেলস, লাফার্গ ও লরার ছবি এবং এঙ্গেলস ও লাফার্গের লেখার প্রতিলিপি আছে। দুই খণ্ডে মোট ৪১০টি চিঠি ছাপা হয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্রয়েড

হোয়াইটহেডের দর্শনের সমালোচক হিসেবে [প্রসেস্ এ্যা আনরিয়ালিটি] হ্যারী. কে. ওয়েলস-এর প্রথম পরিচিতি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্র্যাগম্যাটিজম্-এ (Pragmatism—Philosophy of Imperialism) আমেরিকার শাসকশ্রেণীর জীবনদর্শনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার ফলে তিনি ম্যাক্‌র্থি কোম্পানীর বিরাগভাজন হন। 'জেফারসন্ স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস্' ; (যেখানে তিনি লেক্‌চারার ছিলেন) ম্যাকার্থির কোপ-দৃষ্টির ফলে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর বইখানি নানা ভাষায় অনূদিত হয় ও এই মার্কসবাদী চিন্তাবিদের নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র মারণাস্ত্র ও ডলার মার্কবৃষ্টির উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, সব দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও স্তাবকের দল সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আক্রমণে রত এবং রহস্যবাদ ও অনিশ্চয়তাবাদের কুজ্ঝটিকা জাল সৃষ্টি করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত-করণে সচেষ্ট। তাই জন ডিয়ুই, উইলিয়াম জেমস, চার্লস পিয়ার্স, জনফিসকে ও অলিভার ওয়েণ্ডেলের 'প্র্যাগমাটিক' তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকদের সতর্ক করার পর সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের 'সাইকোএ্যানালিসিস' ও নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাবের দিকে ওয়েলসের নজর পড়ে। মননক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মার্কসবাদী এঙ্গেলস্ ও লেনিনের কিছু কিছু মন্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু মনের জটিল ও সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়ার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অনেকটা উদাসীন। কাজেই ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণাকে যে ভাববাদী দর্শন-সৌধের ভিত্তিকে দৃঢ় করার কাজে লাগানো যায়, এ-সম্বন্ধে অনেকেই ছিলেন অনবহিত। কারণ রাশিয়ান ফিজিওলজিস্ট আইভান পেত্রভিচ পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নব-

---

Freud—(A Pavlovian Critique) Harry. K. Wells, Lawrence & Wishart, London, 1960. 25 sh.

নবতম মস্তিষ্কবিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের পরিচিতির অভাব। ওয়েলস্ বস্তুবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ফ্রয়েডকে বিচার করতে সচেষ্ট হলেন। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর দেশে বেঞ্জামিন ও জেম্‌স্ রাস্ ও পরে থর্নডাইক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানসিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে জেম্‌স্ ও ফ্রয়েডীয় ভাবধারা তাঁদের প্রভাবকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করেছিল বলা চলে। ওয়েল্‌স তাই বলেছেন :

"The Freudian rocket was made in Vienna, but launched in the United States. It is therefore appropriate, for an American to attempt to evaluate the teachings of Freud. In my country psycho-analysis penetrates all aspects of national life and culture, and at the same time comprises an important item of ideological export to the rest of the world."

অনেক পরিশ্রম ও অধ্যয়নের ফলে এই evaluation বা মূল্যায়ন করেছেন ওয়েলস্ তাঁর লিখিত 'পাভলভ য়্যাণ্ড ফ্রয়েড'-এর দুটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে আছে বিখ্যাত শারীবৃত্তবিদ আইভান পেত্রভিচ পাভলভ-এর মস্তিষ্কবিষয়ক গবেষণার ফলাফল, মনোবিজ্ঞানে পাভলভীয় তত্ত্বের অবদান, ও মানসিক রোগের চিকিৎসার উপর পাভলভীয় তথ্যের প্রয়োগবিধি এবং পাভলভীয় প্রত্যয় প্রভাবে মার্কসীয় দর্শনের সমৃদ্ধি ও বিকাশের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের প্রথম জীবনের স্নায়ুবিজ্ঞান-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে। তারপর দেখানো হয়েছে কি ভাবে তরুণ ফ্রয়েড ধীরে ধীরে "myth-making creator of psycho-analysis" হয়ে উঠেছেন। বিরাট সম্ভাবনাময় এক বিজ্ঞানীকে দেখা গেল অবশেষে এক রহস্যময় কাল্ট (cult)-এর প্রবক্তারূপে।

প্যারিতে Charcot-এর অধীনে কিছুকাল কাজ করার পর ফ্রয়েড হামবুর্গে এসে প্র্যাক্‌টিশ শুরু করলেন। দৈহিক আঘাত ছাড়াও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে কেন ? হিষ্টিরিয়ায় অঙ্গবিশেষের প্যারালিসিস বা অন্যান্য আঙ্গিক বিকৃতির কারণ কি ? এই ধরনের রোগীর সংখ্যাই বেশি : তাদের নিরাময়ের উপায় কি ? ভাবতে লাগলেন ফ্রয়েড। এই সময়ে ন্যান্সীতে Bernheim ও Liebault সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবের সাহায্যে হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতেন। এ সময় এই বিষয়ক একখানি বই পড়ার সুযোগ হয়। তিনি ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগ নিরাময়ে প্রথমদিকে ভালো ফল পেতে

লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলেন সব রোগীকে সম্মোহিত করা যায় না। আর দেখলেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটছে মাত্র সাময়িক উপশম। অভিভাবনের উপর তিনি বিশ্বাস হারালেন। বলা উচিত বার্নহাইমের পদ্ধতিতে অভিভাবনে শুধু রোগলক্ষণ দূরীকরণের কথাই থাকত। রোগের মূল অনুসন্ধান করা বা তৎসংক্রান্ত কোনো অভিভাবন দেওয়া তাঁদের রেওয়াজ ছিল না। আর সম্মোহন বা অভিভাবন সম্পর্কিত তাঁদের থিওরি ছিল অবৈজ্ঞানিক। কাজেই রোগলক্ষণের পুনঃপ্রকাশ ঘটত। এই সময় Dr. Joseph Breuer বর্ণিত এক হিষ্টিরিয়া রোগীর কথা ফ্রয়েডের মনে পড়ে। সম্মোহিত অবস্থায় রোগী এমন সব আবেগময় মুহূর্তের কথা মনে করতে পেরেছিল—যে-কথা জাগ্রত অবস্থায় তার মনে আসে নি। পিতার রোগশয্যার পাশে বসে তার অনেক ইচ্ছা হত যা সে সময়ে দমন করা ছাড়া উপায় ছিল না। Dr. Breuer সিদ্ধান্ত করেছিলেন রোগলক্ষণ হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছার ফল। তার নাচবার ইচ্ছা অবদমিত হবার ফলে ঘটেছে তার পায়ের প্যারালিসিস।

এইবার ফ্রয়েডের মনে হল তিনি রোগ লক্ষণের মূল কারণের হদিশ পেয়েছেন। "A psychic injury was caused by the necessity to repress, a strong impulse, while the physical symptoms were substitutes for the action that would have been appropriate for the impulse."

এখান থেকেই ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকে। মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটা অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত দিয়ে তিনি ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন। ফ্রয়েড যখন অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তে ব্যস্ত, ঠিক তখন, সেই ১৮৯৫ সালে আইভান পেত্রভিচ পাভলভ গবেষণাগারে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। ধীরে ধীরে তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে, অনুমানকে প্রশ্রয় না দিয়ে, রাতারাতি সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা না করে এগিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানী ও সত্যসন্ধানী পাভলভ। আর কল্পনাপ্রবণ, দ্রুত-সিদ্ধান্তপ্রয়াসী ফ্রয়েড চরম তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য ব্যগ্র। এই দুই মহারথীর চারিত্রিক বৈপরীত্য এঁদের একজনকে করেছে বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক। আর একজনকে করেছে অনুমানভিত্তিক তত্ত্ব প্রচারক।

মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্য দুজনেই আজীবন সচেষ্ট ছিলেন: তবে তাঁদের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

"While Pavlov sought the solution to the enigma of mental processes and their disturbed states in the functioning of the upper regions of the nervous system, Freud on the contrary pursued the same objectives within the limits of the mind itself, without regard to knowledge of the brain as the organ of mental life."

"Pavlov employed the experimental method of natural science to discover the facts and laws of the reflex activity of the brain, while Freud sought to discover the dynamics of mental processes by probing minds, his own and his patients."

ওয়েলসের এই ভূমিকাই পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে একজনের পদ্ধতি বিষয়গত বা objective, অপরের পদ্ধতি অন্তর্দর্শী বা introspective।

প্রথম থেকেই ফ্রয়েডকে দ্বয়বাদী রূপে দেখা যায়—বলছেন ওয়েলস্। কিন্তু তাঁর দ্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি মনে করতেন মস্তিষ্ক মননক্রিয়ার আধার আবার বলতেন:

"I have no inclination at all to keep the domain of the psychological floating, as it were in the air, without any organic foundation. But I have no knowledge neither theoretically not therapeutically, beyond that conviction, so I have to conduct myself as if I had only the psychological before me."

ফ্রয়েডের চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অবাধ ভাবানুষঙ্গ, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ও পরিবৃত্তি (transference) সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা সকলেরই আছে। জীবনের বেশির ভাগই ফ্রয়েড ব্যয় করেছেন 'অবদমন'-এর বিচার-বিশ্লেষণেও ঐ সম্পর্কিত অধ্যয়নে। অবদমিত অভিলাসের নির্গমন পথ নিয়েই ফ্রয়েডীয় গবেষণা। উপরে উদ্ধৃত তিনটি পথ ছাড়া আরও তিনটি পথের হদিশ পেয়েছেন ফ্রয়েড। নিউরোটিক রোগ উপসর্গ; দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি ও পরিহাস এই তিন পথেও অবদমিত অভিলাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। পরিহাস তাঁর মতে আক্রমণাত্মক ও প্রলোভনসঙ্কুল অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক। এই সব নিয়ে জীবনের শেষভাগে ফ্রয়েড তাঁর

জীবনদর্শন গড়ে তোলেন ও এই দর্শনের নাম দিলেন 'Metapsychology'। তাঁর এই 'মেটাসাইকোলোজি'র যে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—একথা ফ্রয়েড নিজেই স্বীকার করেছেন।

"The indefiniteness of all our discussions on what we describe as metapsychology is of course due to the fact that we know nothing of the excitatory process that takes place in the elements of the psychical systems, and that we do not feel justified in framing any hypothesis on the subject. We are consequently operating all the time with a large unknown quantity, which we are obliged to carry over into every new formula."

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমী দুনিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তির জোয়ার আসে, তারই সুযোগে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা আন্দোলন বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্বের গণ্ডী পেরিয়ে এ আন্দোলন জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি সব কিছুতেই ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা মনঃসমীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করেন, ফলে ফ্রয়েড এবং সাইকোঅ্যানালিসিস্ পৃথিবীর সকল শিক্ষিত নর-নারীর কাছে অতিপরিচিত হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি প্রসিদ্ধি লাভ করে আর একটি কথা—ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স। বালক শৈশব থেকেই মাকে ভালোবাসে ও পিতার প্রতি পোষণ করে ঘৃণা ও শ্রদ্ধা। মায়ের প্রতি ভালোবাসায় পিতা তার প্রতিদ্বন্দ্বী—কাজেই পিতার মৃত্যুই তার কামনা। এ-কামনাকে সে ভয়ে বা ভক্তিতে অবদমন করতে বাধ্য। অবদমিত কামনা নির্জ্ঞান মনে এসে বাসা বাঁধে ও সেখানে সঞ্চিত থাকে "charge of psychic energy"। বালকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার নির্জ্ঞান মনের এই মাতৃলিপ্সা ও পিতৃনিধন ইচ্ছাকে সমাজানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত করার সাফল্যের উপর। এই হচ্ছে সোজা কথায়—ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স। ইলেকট্রা কমপ্লেক্স এর উল্টো পিঠ।

ফ্রয়েডের মতে সামাজিক সম্পর্ক, নীতিবোধ, ধর্মাধর্ম বিচার সবই এই ঈডিপাস কম্প্লেক্স-নির্ভর।

"Their origin and development have nothing to do with the labor process not with the relations people enter into based on the way they obtain food, clothing and shelter!"

শুধু তাই নয়। ইতিহাসেরও স্রষ্টা এই ঈডিপাস কমপ্লেক্স। ইতিহাস ফ্রয়েডের মতে, শক্তিশালী পুরুষেরা সৃষ্টি করে। জনসাধারণের অভিলাষ শক্তিশালী পিতরোপম পুরুষের আজ্ঞাবাহী দাস হওয়া। নীট্‌শের 'সুপারম্যান' তত্ত্বকে ঈডিপাসের আওতায় দাঁড় করিয়ে ফ্রয়েড এই অভিমত প্রকাশ করেছেন:

"We know that the great majority of people have a strong need for authority, which they can admire, to which they can submit, which dominates and sometimes ill-treats them...It is the longing for the father that lives in each of us from his childhood days, for the same father whom the hero of legend boast of having overcome."

ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের এই হচ্ছে ফিলজফি।

ফ্রয়েডের মতে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির দাস। এই সহজাত প্রবৃত্তি দুই ধরনের: কামাত্মক আর ধ্বংসাত্মক,এদের একসঙ্গে বলা হয় Death-Eros. Instinct। যুদ্ধ তাই ফ্রয়েডের মতে স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষের সহজাত ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি যুদ্ধের কারণ, কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য।

নারী সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সুবিদিত হলেও ওয়েলস্-এর মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য:

"Instead of tracing the position of women to the conditions existing in certain stages of society, he attributes it to recognition on the part of both sexes of an alleged anatomical 'deficiency' in women. Young girls, he holds, assign the lack of the male anatomy to castration as punishment for sin and if they are to progress normally into "feminimty", they must accept an inferior and and passive condition."

এ উক্তি ফ্রয়েড-নিপীড়ক নাৎসীরা কাজে লাগিয়েছেন!

সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তাত্ত্বিকদের মতে:

"The division of mankind into classes is the result not of

historical forces, but of permanent inborn differences in human nature."…"Imperialism, with its super-exploitation and oppression of colonial semi-colonial countries requires this doctrine above all others.…And even more significant the doctrine of national or racial superiority is a powerful means of keeping the working people of the imperialist nation from joining with oppressed nations against their common enemy. In this form, the doctrine of innate superiority is chauvinism and white supremacy" [Harry K. Wells Ivan. P. Pavlov: International Publishers].

ওয়েসল-এর এই সব উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি ফ্রয়েডীয় ভাবধারার গুরুত্বের পরিমাণ। শুধু যদি একটা রোগ-নিরাময়ের পদ্ধতি হত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা, তাহলে তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন থাকত না। মনোবিদ ও চিকিৎসকমণ্ডলীর গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকত ফ্রয়েড-এর নাম। ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণার প্রভাব যদিও আজ ক্ষীয়মাণ তবুও অনস্বীকার্য যে আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপের কতকাংশে এখনও তার প্রবল আধিপত্য। কারণ হিসেবে ওয়েলস বলেছেন: শিক্ষিত লোকের মনে 'দ্বয়বাদ'-এর (dualism) প্রভাব অপরিসীম। হাজার হাজার বছরের শ্রেণীসমাজের শোষণপীড়নকে সমর্থন করার প্রচেষ্টায় ভাববাদ-দর্শন নানাভাবে প্রচারিত হয়ে মানুষের বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। ফ্রয়েড পৌরাণিক কাহিনী ও প্রচলিত সংস্কারের পুরনো মদ নতুন বোতলে পরিবেশন করাতে অতি সহজেই জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হলেন। অবশ্য মনে রাখা দরকার জীবনের প্রারম্ভে ফ্রয়েড সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করেছিলেন ও বিজ্ঞানীমহলে অল্পবিস্তর পরিচিতি লাভও করেছিলেন। সে সময় মধ্যযুগীয় অনুশাসনে নর-নারীর প্রেম ও যৌনজীবন অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় অনুশাসন ও ভিক্টোরিয়া যুগের 'পিউরিটানিজম'-এর বিরুদ্ধে ফ্রয়েডীয় 'যৌনসর্বস্ব' (Pan-sexualism) মতবাদ তরুণদের কাছে প্রগতিশীল বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম দিকে যাঁরা তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাধারী

এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল নীতিবাগীশের দল। কাজেই সে-সময়ে ফ্রয়েডীয় ভাবধারা শুধু জনপ্রিয় নয়, অনেকের কাছে প্রগতিশীল জীবনদর্শন বলেও প্রতিভাত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সব থেকে বড় কথা, অদ্বয়-বস্তুবাদী দর্শনের প্রসার বা প্রচার বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর অনভিপ্রেত। কাজেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথাকে নানা রঙে রাঙিয়ে এক 'প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক' ভাবধারা বলে চালু করার জন্য শাসকশ্রেণী ও তাঁদের তাঁবেদার ও উপদেষ্টা বুদ্ধিজীবীদের ছিল যথেষ্ট স্বার্থ ও আগ্রহ। একচ্ছত্র পুঁজিবাদ নানা কৌশলে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও নেতৃত্বের মূল সূত্রগুলির মধ্যে 'সহজাত প্রবৃত্তিবাদ ও যৌনসর্বস্বতা'র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মার্কসবাদকে হেয় ও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে—এটাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানাশ্রিত পাভলভীয় মতবাদ প্রথমত শারীরবৃত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য নয়; দ্বিতীয়ত অদ্বয়-বস্তুবাদ দর্শনের (materialism-monism), সম্যক উপলব্ধি শ্রেণীসমাজের বিলোপ ও নতুন পরিবেশ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ওয়েলস-এর ভাষায়: "For as long as there is a powerful, though minority class of people which has a life and death stake in maintaining idealism as a buttress to its control over the majority, there will be concerted efforts both to prevent wide-spread knowledge of the science of higher nervous activity, and to encourage all forms of idealist and obscurantist notions about mental life, from the theological soul and spirit to the psycho-analytical instinct and unconscious."

সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্রের প্রধান বক্তব্য "you can't change human nature।" আজ এই 'শোষণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা'মূলক (exploitive and competitive) সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষের চরিত্রে ও মানসিকতায় যে-সব দোষ-ত্রুটি, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য দেখা যায়—সেগুলিই মানুষের সনাতন ও শাশ্বত মানসিক ধর্ম। সুতরাং সুযোগসুবিধা দিলেও মানুষের হৃদয়ের বা মননধর্মের পরিবর্তন অসম্ভব; সাম্যবাদী সমাজ গড়ার কল্পনা আকাশকুসুম। এ ছাড়া রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য: কাজেই সমানাধিকার বা সকলের পক্ষে সমান সম্ভাবনা কোনোদিনই আসতে পারে না। কাজেই পাভলভীয় সিদ্ধান্ত: "All peoples are endowed with the same

essential nervous apparatus for the development of conscious-ness and human nature generally. According to this scientific psychology there are no innate differences in the higher nervous mechanisms of classes, races, nations or the sexes." (Wells) আমেরিকা বা পশ্চিমী দুনিয়ায় অচল। তেমনি অসহনীয় পাভলভের বক্তব্য: "The chiefest, strongest and most permanent impression we get from the study of higher nervous activity by our methods is the extra-ordinary plasticity of this activity, and its immense potentialities ; nothing is immobile or intractable, and every-thing may always be achieved, changed for the better, provided only that the proper conditions are created।"

পাভলভ ও ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের বিভিন্নতা এবং সে-সবের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের মধ্যেই ওয়েলসের আলোচনা পর্যবসিত নয়। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি নিপুণভাবে ফ্রয়েড ও পাভলভ-এর বিভিন্ন গবেষণাধারা বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাভলভ-এর লালাগ্রন্থি নালী (salivary fistula) ও ফ্রয়েডের স্বপ্ন-নালীর (Dream Fistula) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই সূত্রে এই দুই মহারথীর গবেষণা-প্রণালীর পার্থক্য তিনি পাঠকদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। মনঃসমীক্ষা বা স্বপ্ন-বিশ্লেষণের প্রধান উপায় হল introspection। এখানে সব কিছু নির্ভর করছে রোগীর নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ, বিচারবুদ্ধি, অনুভবের তারতম্য ; তার মেজাজ, personal bias ইত্যাদির উপর ; এককথায় এ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে subjective। সাবজেকটিভ কথাটিকে ওয়েলস এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "It means determination by the make-up of the individual mind, rather than by objective conditions and facts. অপরপক্ষে পাভলভীয় পদ্ধতি পুরোপুরি অবজেকটিভ—objective means viewing phenomena as external and apart from self-consciousness." এছাড়া পাভলভ-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে কোনো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো অন্যের দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারে ও পরীক্ষার ফলাফলের তথ্যাদির সত্যতা নিরূপিত হতে পারে। জন হপকিন্স ও কর্নেলে, গ্যান্ট ও লিডেল পাভলভ-এর গবেষণা অনেকবার নিজেদের

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেছেন ও ফলাফলের যাথার্থ্য নিরূপিত করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-নালীর প্রাপ্ত ফলাফলের যাথার্থ্য নিরূপণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। মনে রাখা দরকার এই লালা-নিঃসরক নালী (Salivary Fistula) থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত পাভলভ-এর কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স তত্ত্ব আর স্বপ্ননালী বা Dream Fistula থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেষ বিশ্লেষণের উপর ফ্রয়েডের অবদমন তত্ত্বের ভিত্তি।

ওয়েলসের এই বই-এর চতুর্থ অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ পনেরো বছর থেকে ফ্রয়েড ও পাভলভ নিয়ে নানা স্থানে বহু লোকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দেখেছি এঁরা সকলেই প্রায় পাভলভকে ওয়াটসন প্রমুখ behaviourist-এর দলে ফেলেছেন। ফ্রয়েড যেমন সহজাত প্রবৃত্তিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, চিন্তাভাবনার প্রধান নিয়ামক ও নির্ধারক বলে কল্পনা করেছেন, ওয়াটসন তেমনি একেবারে বিপরীত মত, অর্থাৎ পরিবেশ, অভ্যাস ও শিক্ষাকে মানসিকতার একমাত্র নিয়ন্ত্রক বলে প্রচার করেছেন। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই দুই মতই একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত। ওয়েলস বলছেন : "Pavlov does not deny innate activity as the Behaviourists have done. On the contrary, he shows experementally that there can be no learning at all without inborn reactions." সহজাত প্রবৃত্তি বা instinct-এর অস্তিত্ব নিয়ে পাভলভ-ফ্রয়েড-এর মতভেদ নয়। মতভেদ এই প্রবৃত্তির শক্তি ও প্রকৃতি নিয়ে। পাভলভ অবশ্য instinct কথাটি ব্যবহার করতে চাইতেন না। পাভলভ বলেছেন : "Unconditioned Reflexes"। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয় ; যদিও এদের শক্তি অপরিসীম। এদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স—যা পরিবেশের সূক্ষ্ম ও জটিল পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম ও তদনুযায়ী মানুষকে (প্রাণী) পরিবেশের সঙ্গে শুধু মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নয়, পরিবেশকে পরিবর্তনের ব্যাপারেও মানুষের সহায়ক। "There are according to Pavlov, relatively few higher nervous Unconditioned Reflexes and even these are only a foundation on which the psychic activity of the animal or man or animal must be acquired during life." (Wells) এ ছাড়া পাভলভ-এর উত্তরসূরীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে 'আনকণ্ডিশনড রিফ্লেক্স' যতই শক্তিশালী

হোক, কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স তাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। শিক্ষার অপরিসীম শক্তি অনস্বীকার্য। অর্থাৎ মানুষ পশু থেকে বিবর্তিত হয়েও পাশবিক নয়; গুণগত ভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। সামাজিক পরিবেশের উন্নতি মানবিক চরিত্রের উন্নতি আনয়নে সক্ষম। ওয়েলস-এর আশা আমরা আগামী দিনের সমাজে নতুন মানুষ ও মানবিক চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখতে পাব, নিঃসন্দেহ। এবং এ-আশা তিনি পোষণ করেন পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা থেকে।

ফ্রয়েডের সম্বন্ধে ওয়েলস-এর উপসংহারী উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "The dualistic, subjective idealism of his approach to the human mind posed little scientific danger to the semi-official ideology (of U. S. A.). On the contrary it by and large enhanced that ideology by giving obscurantism a broader base in the mind and culture of the American people. আর পাভলভ সম্বন্ধে বলেছেন: "The conistent and militant monistic materialism of the science of higher nervous activity was, and is, in the sharpest possible opposition to the prevailing manner of thought. This in itself is sufficient to account for the relatively slow rate of recognition of Pavlov's science.

যাঁরা বস্তুবাদ-দর্শন ও মার্কসিজম্-এর ছাত্র তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এই বই ও এর পূর্বে প্রকাশিত Pavlov and Freud-এর প্রথম খণ্ড (I. P. Pavlov. Wells—International Publishers, U. S. A., 1956) [illegible] মূল্যবান। সাধারণ পাঠকদের কাছে প্রথম খণ্ডের মূল্য অপরিসীম, কেননা পাভলভ সম্পর্কিত সুলিখিত বই ইংরাজী ভাষায় খুবই কম।

শঙ্কর চক্রবর্তী

আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি সমস্যা

একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী দুঃখ করে বলেছিলেন, অন্য সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে জিনিসপত্র নাড়াচড়া করে একটা পরীক্ষা-কাজ চালাবার সুযোগ রয়েছে কিন্তু জ্যোর্তিবিজ্ঞানে একমাত্র উপাদান হল আলোর সঙ্কেত। এ এমন একটি বস্তু যাকে ভাঙ্গাগড়ার স্বাধীনতা নেই—তার সূক্ষ্মদেহকে এতটুকু বিকৃত না করে অতি সাবধানে মর্মবাণীটুকু উদ্ধার করে নিতে হবে।

এ উক্তিটুকুর পেছনে খানিকটা আক্ষেপ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্যোতিবিজ্ঞানী যে জগতে বাস করেন, সেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে এক মহানাটকের অভিনয়; যে-নাটকের কুশীলবগণের মনোভাবের প্রকাশ হয় আলোর হাতছানিতে আর দর্শকরূপে বিজ্ঞানী বিস্ময়পুলকে রোমাঞ্চিত হন, এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ করেন।

এই আনন্দকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির স্তরে না রেখে সাধারণের জন্যে বিতরণ যিনি করতে পারেন, তিনিই গুণী। লভেল সাহেব দুনিয়ার অন্যতম সেরা রেডিও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী। ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাছে জডরেল ব্যাঙ্কে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও জোরালো যে-রেডিও দূরবীণ যন্ত্র রয়েছে, সেটি তাঁরই নির্দেশে তৈরি এবং তিনি ঐ গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ। B. B. C.-তে রিথ্ লেকচাররূপে কয়েক বছর আগে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলিই পুস্তকাকারে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

জগজিত সিংয়ের পুস্তকের বিষয়বস্তু তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক ও স্বল্প পরিমাণে জটিল। Cosmology হল এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে পদার্থবিদ্যা,

---

The Individual and the Universe—A. C. B. Lovell. Oxford University Press, London. 10s. 6d.

Great Ideas and Theories of Modern Cosmology—Jagjit Sing. Dover Publications. Inc. New York. 1 Doller 85 Cents.

গণিত ও জ্যোর্তিবিত্থার একটি সহজ সমন্বয় ঘটেছে। বিজ্ঞান গবেষণায় সরাসরি নিযুক্ত না থেকেও লেখক যে-অনায়াসভঙ্গিতে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল ধ্যানধারণার মহাসমুদ্রে বিচরণ করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্থাকেও (যা প্রায় metaphysics-এর পর্যায়ে গিয়ে পৌছয়) লেখক পরিস্ফুট করে তুলেছেন। উভয় লেখকই অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।

এক

এই মহাবিশ্ব অসীম, অনন্ত না সসীম—এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান নিয়ে জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা আজো বিব্রত হয়ে আছেন। কোটি কোটি তারা নিয়ে একটি তারাজগত (galaxy), অনন্ত কোটি তারাজগতের সমবায়ে এই মহাবিশ্ব—আপাতদৃষ্টিতে অসীম রূপে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। আলোর দূরবীণ যন্ত্রের মাধ্যমে ৩০০ কোটি আলো-বছর (আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল) দূরের তারাজগতের সন্ধান পাওয়া গেছে। রেডিও দূরবীণের সাহায্যে দৃশ্য জগতের এই সীমা আরো বিস্তৃত হতে চলেছে। (বহু তারা আলোর সঙ্গে রেডিও-ঢেউ পাঠিয়ে থাকে, একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় যার উৎপত্তি)।

একটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আলো ও রেডিও-দূরবীণ যন্ত্রে ধরা পড়ছে এই মহাবিশ্বের এক বিরাট প্রসারণ (great expansion)। সমগ্র তারাজগত দূর থেকে ক্রমে আরো দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে এক প্রচণ্ড গতিতে। ২৬ কোটি আলো-বছর দূরে সিরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষেত্রে এই গতির পরিমাণ সেকেণ্ডে ১০,৫০০ মাইল, ১৪০ কোটি আলো-বছর দূরে ভার্গো নক্ষত্রজগতের বেলায় সেই গতি সেকেণ্ডে ৩৮,০০০ মাইল। সেকেণ্ডে ৬২,০০০ মাইল গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে যে তারাজগত, জ্যোর্তিবৈজ্ঞানিক ক্যামেরাযন্ত্রের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্যে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রেডিও দূরবীণের ক্ষেত্রেও এমন তারাজগতের রেডিও-ঢেউ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যারা প্রায় আলোর কাছাকাছি গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আলো সবচেয়ে গতিশীল বস্তু)। সেই সীমা ছাড়িয়েও তারাজগত থাকতে পারে, কিন্তু তারা চিরদিনের জন্যে আমাদের অগোচরেই থেকে যাবে।

দূরবীণ যন্ত্রের চরম উৎকর্ষসাধন হলেও তাদের সন্ধান আমরা কোনোদিনই পাব না।

কাজেই মহাবিশ্ব অনন্ত কি না, পরীক্ষামূলকভাবে তা জানবার উপায় বিজ্ঞানীদের নেই।

দুই

পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে স্থানচ্যুত করে কোপার্নিকাস মধ্যযুগের চার্চের কাছে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীতে সমস্ত গুরুভার বস্তু স্থানচ্যুত হলেই কেন মাটিতে এসে আশ্রয় নেয়, এ প্রশ্নের জবাব তাদের জানা ছিল না। নিউটন তাঁর সর্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করলেন।

ইউক্লিডের জ্যামিতি ও নিউটনের বিজ্ঞান—এই দুটি প্রধান খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্বের যে-ছবিটি আমাদের কাছে তুলে ধরছিল, তার দুটি মোদ্দা কথা হল এই—এই মহাবিশ্ব আকারে অনন্ত এবং তার সমগ্র অঞ্চল একই ধর্ম ও নিয়মের বশীভূত। ইউক্লিডের যুক্তি ছিল এত অভ্রান্ত, যে বহু শতাব্দীব্যাপী জ্যামিতিশাস্ত্র পরিগণিত হচ্ছিল সবচেয়ে নিখুঁত ও নিশ্চিত বিজ্ঞানরূপে, যার জন্যে প্লেটো ঈশ্বরকে জ্যামিতিবিদ (geometer) বলে অভিহিত করেছিলেন। নিউটনীয় বিশ্বে সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক নিয়ম হল মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাবিশ্বের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে চলেছে এই মাধ্যাকর্ষণ বলের (force) মাধ্যমে।

আইনস্টাইন বিশ্বের এই ধারণাকে পালটে দিলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের মাধ্যমে (general theory of relativity)। তাঁর মতে মাধ্যাকর্ষণকে একটি বল রূপে ব্যাখ্যা করা ভুল বরং এভাবে বলাটা ঠিক হবে যে এর প্রভাবে বস্তুমাত্রেরই চতুষ্পার্শবর্তী অঞ্চল বক্রাকৃতি লাভ করে।

মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তুর প্রভাবে তাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চল (স্পেস্) বক্রতাধর্মী। এই স্পেস অনন্ত নয়, সসীম ; ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুযায়ী স্পেসে দুটি বিন্দুর মধ্যেকার সর্বনিম্ন দূরত্ব হল একটি সরলরেখা এবং সেখানে একটি রেখার সমান্তরাল আর একটি রেখা টানা সম্ভব। কিন্তু আইনস্টাইনের স্পেসে কোনো সরলরেখাই টানা সম্ভব নয় (যেহেতু স্পেস্মাত্রেই বস্তুর প্রভাবে বক্রাকৃতি)। এখানে দুটি বিন্দুর মধ্যেকার নিম্নতম দূরত্ব হলো একটি বৃহৎবৃত্ত

(great circle) এবং কোনো সমান্তরাল সরলরেখা আদৌ অঙ্কন করা সম্ভব নয় (Riemannian জ্যামিতি অনুযায়ী)। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেল, একটি নক্ষত্রের আলোকরেখা সূর্যের পাশ দিয়ে আসার সময় বক্রাকৃতি লাভ করল এবং সূর্যের চারপাশে বুধগ্রহের কক্ষপথে যে বিচ্যুতি (perturbatidus) তাও স্পেসের বক্রতার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। একই কারণে একজন যাত্রী স্পেসের কোনো জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে সমগ্র মহাবিশ্বকে ঘুরে আবার সেখানেই ফিরে আসতে পারেন।

আইনস্টাইনের বিশ্বে কাল বা সময়ের মাপ ছাড়া কোনো ঘটনার ধারণা করা সম্ভব নয়, তাই এ বিশ্ব হল space-time-continuum. নিউটনের বিশ্বে কোনো ঘটনা পরস্পরের কাছ থেকে বহু দূরবর্তী দুটি প্রদেশের (যেমন পৃথিবী ও নক্ষত্র সিরিয়াস) বাসিন্দার দৃষ্টিতে একইভাবে ধরা পড়বে। কিন্তু আইনস্টাইনের বিশ্বে দুজন দর্শক একই ঘটনাকে কখনোই একইভাবে (simultaniety of events) দেখতে পাবে না, যেহেতু একই গতিতে ধাবমান আলো দুজনের কাছে বিভিন্ন সময়ে পৌছবে।

তিন

আইনস্টাইনের বিশ্বতত্ত্বে মহাবিশ্বের যে চেহারাটা পাওয়া গেল, তার প্রকৃতি জড়ধর্মী (static)। এখানে দুটি বলের মধ্যে একটি সাম্য বিরাজ করে। তারা হল মাধ্যাকর্ষণ ও মহাবিকর্ষণ (cosmic repulsion)। একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে বহু দূরত্বে থাকলে তাদের মধ্যেকার আকর্ষণবলের চেয়ে প্রবলতর হয় একটি বিকর্ষণবল (মহাবিকর্ষণ)। এ-যেন এক দাঁড়িপাল্লা যার দুটি পাল্লায় সমান ওজন চাপানো। কোনোদিকে ঝুঁকে পড়লেই মহা বিপদ। মাধ্যাকর্ষণের জোর বাড়লে মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তু এক মহাসঙ্কোচনের প্রভাবে একটিমাত্র বস্তুপিণ্ডে এসে জড়ো হবে। উল্টোদিকে মহাবিকর্ষণের মাত্রা তুলনায় সামান্য বাড়লেও মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হতে হতে এক চরম শূন্যতায় এসে পৌছবে। যে-বিশ্বতত্ত্বে সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্ব একটি সুতোর ওপরে ঝুলছে, স্বভাবতই তা বহু তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। (আইনস্টাইন cosmic repulsion-এর তত্ত্বটিকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে পরে স্বীকার করেছিলেন)। রুশ অঙ্কবিদ ফ্রীডমান আইনস্টাইনের মূল সমীকরণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে দুটি বিশ্বের মডেল

পাওয়া যাচ্ছে—একটি আন্দোলনধর্মী (oscillating), আর একটি প্রসারণধর্মী (expanding)। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের সমগ্র নক্ষত্রজগতের বস্তু একটি বিশেষ ঘনীভূত অবস্থায় সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। তারপরে শুরু হল প্রসারণ। প্রথম ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত প্রসারণের সীমায় পৌছে মহাবিশ্ব আবার সঙ্কোচনের বশীভূত হচ্ছে এবং চরম সঙ্কোচন থেকে আবার শুরু হচ্ছে প্রসারণ। এই পালা অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কেবলই প্রসারণের পালা। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্‌ল-এর পরীক্ষা থেকে মহাবিশ্বের প্রসারণের সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেল।

চার

মহাবিশ্বের সমগ্র তারাজগতের ক্রমপ্রসারণের (আমাদের তারাজগত ছায়াপথ বা milky way থেকে দূরে সরে যাওয়া) গতিবেগের ভিত্তিতে হাব্‌ল দেখালেন যে, তারা সবাই আজ থেকে ৮০০ থেকে ৯০০ কোটি বছর আগে এক ঠাঁই হয়ে ছিল। এই বিপুল সময়ের মধ্যে সমগ্র তারাজগতের ক্ষেত্রেই এক বিপুল বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু যে প্রাথমিক বস্তুপিণ্ড থেকে তারা গড়ে ওঠে, সেটি যে জায়গা জুড়ে ছিল আজকের বিপুল মহাবিশ্বের তুলনায় তার আয়তন ছিল খুবই ছোট।

Abbe Lemaitre ১৯৩৩ সালে মহাবিশ্বের একটি নতুন সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বললেন—যার নাম Evolutionary theory বা 'বিবর্তনতত্ত্ব'। লেমেইতার-এর মতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল একটি অত্যন্ত ঘনীভূত, ছোট বস্তুপিণ্ড থেকে, যাকে তিনি বলছেন প্রাথমিক পরমাণু (primeval atom)—সমগ্র তারাজগতের বস্তু যার মধ্যে জড়ো হয়ে ছিল এবং তার ঘনত্ব ছিল এত বেশি যে প্রতি ঘন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষেত্রে বস্তুর ওজন ছিল প্রায় দশ কোটি টন। এই বস্তুপিণ্ডের মাঝে দেখা দেয় এক বিরাট বিস্ফোরণ এবং তার ফলে সমগ্র বস্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কয়েক শ বা কয়েক হাজার কোটি বছর বাদে এই প্রসারণের বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। তখন মহাবিশ্বের মোট ব্যাপ্তি ছিল হয়তো একশ কোটি আলো-বছর। এই অবস্থায় মহাবিশ্বের প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায় স্থিতিধর্মী (আইনস্টাইন-বিশ্বের মত)—যেখানে মাধ্যাকর্ষণ ও মহাবিকর্ষণ একে অপরের সমতা বজায় রেখে চলছিল। প্রাথমিক বস্তুপুঞ্জ থেকে সমগ্র তারাজগতের গঠনপর্ব এই সময়েই ঘটেছিল। এরপর দুই

বিপরীতমুখী সমধর্মী বলের মধ্যে সাম্য হারিয়ে মহাবিকর্ষণ বল জোরালো হয়ে ওঠে এবং সমগ্র মহাবিশ্ব এক বিরাট প্রসারণের ধারায় ৯০০ কোটি বছরের এক সুদীর্ঘ কাল পেরিয়ে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে।

তারাজগতের গঠনপর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাবিশ্বের বিবর্তনের যে ধারা, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাবলী দিয়ে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তার পূর্ববর্তী পর্বকে বিচার করতে বসলেই যত অনিশ্চয়তা ও জটিলতা মাথা তুলতে থাকে। ঠিক কতটা সময় পেছিয়ে গেলে প্রাথমিক পরমাণুর যুগে পৌঁছনো যাবে, সঠিকভাবে তা এই বিশ্বতত্ত্ব থেকে জানবার উপায় নেই।

সেই 'প্রাথমিক পরমাণু'র আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ ছিল, তা অনুধাবন করতে গিয়েও থেই হারিয়ে ফেলতে হয়। এখানে দেখা দেয় আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞানের অনির্দেশ্যবাদ (principle of uncertainty)। একটি বস্তুর সমগ্র পরমাণুর কোনো একটির সঠিক প্রকৃতি (তার ভর ও অবস্থান) কোনোমতেই জানা সম্ভব নয়; আমরা শুধু সেই ঘটনাকেই অনুধাবন করতে পারি যেখানে অনেকগুলি পরমাণু সংশ্লিষ্ট। 'প্রাথমিক পরমাণু'র অবস্থাটাও যেন এই একটি পরমাণুর মতো, তা ভেঙে যখন বহু হয় (অগণিত তারাজগতের মাধ্যমে), তখন থেকেই তার প্রকৃতি বা ধর্ম আমাদের কাছে বোধগম্য হতে পারে।

পাঁচ

গ্যামো 'প্রাথমিক পরমাণু'র একটি অন্য চেহারা দিলেন। তাঁর মতে এর সবটাই ছিল প্রচণ্ড তপ্ত তাপীয় বিকীরণ (thermal radiation)। প্রসারণের ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে মহাবিশ্বের তাপ ছিল ১০০ কোটি ডিগ্রি, একদিন বাদে তাই নেমে আসে চার কোটি ডিগ্রিতে। কাজেই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ মহাবিশ্বের জীবনের প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। গ্যামোর মতে সমগ্র বিশ্ব গোড়া থেকেই প্রসারিত হয়ে চলেছে, মধ্যে কোনো স্থিতিধর্মী পর্ব দেখা দেয় নি।

মহাবিশ্বের 'বিবর্তনতত্ত্বে'র প্রথম প্রবক্তা চার্চের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাঁর চেতনায় মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা মানুষের বুদ্ধির অনধিগম্য মনে হওয়া বিচিত্র নয়; সমস্ত যুক্তিতর্ক যেখানে অচল হয়ে বসে।

গ্যামো অবশ্য এ-প্রসঙ্গে বলছেন যে, 'প্রাথমিক পরমাণু' থেকে মহাবিশ্বের সূচনা নয়, বরং এ তার সংকোচনপর্বের একটি বিশেষ অবস্থা। মহাবিশ্ব হয়তো এর বহু আগে থেকেই বিরাজ করছিল।

তবে 'প্রাথমিক পরমাণু' তত্ত্ব অনুসারেই যদি মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তা চিরদিনই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের বাইরে থেকে যাবে। কারণ ছ হাজার কোটি বছর আগে যে অবস্থা ছিল, তা আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।

অধ্যাপক লভেল তাঁর গ্রন্থে 'The Origin of the Universe' অধ্যায়ে এ-প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

ছয়

মহাবিশ্বের 'বিবর্তনতত্ত্ব' অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের অন্তিম পরিণতি এক শীতল মৃত্যু। সমগ্র নক্ষত্রজগৎ প্রসারিত হতে হতে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। প্রসারণের ফলে সমগ্র মহাবিশ্বও অনন্ত রূপ লাভ করে চলেছে। ফলে একদিন মহাবিশ্বের বস্তুরূপে এক অতিতনুর পর্যায়ে এসে পৌঁছবে (material thinning of the universe)। [সমগ্র নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তারা তাদের প্রথম অবস্থা—Main sequence—(যেমন আমাদের সূর্য) পর্ব থেকে বহু লক্ষ কোটি বছর পরে রূপান্তরিত হচ্ছে white dwarf বা শ্বেত বামন রূপে, যেখানে আমাদের সূর্য তাপই হারিয়ে ও ক্রমে ছোট হতে হতে চাঁদের মতো একটি শীতল ছোট বস্তুতে পর্যবসিত হবে। এ হল মৃত নক্ষত্র।] সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জ আবার তাদের তাপশক্তিকে ক্রমাগত বিকীরণের মাধ্যমে মহাকাশে ছড়িয়ে চলেছে। Second law of thermodynamics অনুযায়ী ক্রমেই এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন সমগ্র মহাবিশ্বের তাপশক্তি সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে গিয়ে একটি বিরাট নিস্পন্দের কোঠায় এসে পৌঁছবে; সমস্ত জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ চিরকালের মতো অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে যাবে—সেই পর্বটা হল মহাবিশ্বের তাপমৃত্যু (heat death of the universe), তাপযুক্ত হয়ে নয়, তাপ-বিহনে মৃত্যু।

সাত

মহাবিশ্বের এই শোকাবহ পরিণতি যে-তত্ত্বের শেষ কথা, তার বিরুদ্ধে আর একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন Gold Hoyle ও Bondi—যার নাম

steady state theory। এই তত্ত্বের মূল কথাটা হল মহাবিশ্বের কোনো আদি নেই, অন্ত নেই—এ এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। মহাবিশ্বে নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটছে, তারাজগত ক্রমপ্রসারণের আবেগে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে—এই ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে বস্তুর ধ্বংস সূচিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে এই মহাবিশ্বের সর্বত্র বস্তু অবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাজেই অপসৃয়মান তারাজগতের স্থান গ্রহণ করছে অন্য নতুন তারাজগত এবং মোটামুটিভাবে মহাবিশ্বের চেহারাটা থাকছে একই রকম। এ অতীতেও যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমনি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একইরূপে থাকবে।

এই তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞান জগতে আর একটি বড় সমস্যা সৃষ্টি করে তুলল। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং শক্তিকে বস্তুতে রূপ দেওয়া যায় কিন্তু কিছু-না (nothingness) থেকে বস্তুর সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে সমগ্র স্পেস জুড়ে, সেইটেই প্রশ্ন। ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের conservation of matter তত্ত্ব এখানে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মহাবিশ্বে শক্তি থেকে বস্তুতে রূপান্তরের কোনো প্রমাণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে এখনো পাওয়া যায় নি।

আট

দুটি তত্ত্বের মধ্যে steady state theory অনেক বেশি বস্তুবিজ্ঞানসম্মত এবং মানুষের মনের কাছে এর আবেদনও অনেক বেশি।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে বিবর্তনতত্ত্বের সপক্ষে যুক্তির পরিমাণ বেশি। তবে অত্যন্ত জোরালো রেডিও দূরবীণের সাহায্যে যদি কোনো দিন ৮০০ কোটি আলো-বছর দূরের কোনো রেডিও-তারাজগতের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো দুটি তত্ত্বের মধ্যে কোনো একটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। বিবর্তনতত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের গঠনপর্বের ঐ প্রথম অধ্যায়ে তারাজগতের ঘনত্ব (বর্তমানে একটি তারাজগত থেকে আর একটি তারাজগত, যেমন আমাদের ছায়াপথ থেকে এ্যাণ্ড্রোমিডার দূরত্ব কুড়ি লক্ষ আলো-বছর ;) অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক দূরত্ব ছিল অনেক কম। Steady-state তত্ত্ব অনুযায়ী তা হবার কথা নয়, যেহেতু মহাবিশ্বের চেহারাটা বরাবর একই রকম রয়েছে, কাজেই যে-কোনো সময়ে যে-কোনো স্থানে তার ঘনত্ব একই রূপে থাকবার কথা।

নয়

আধুনিক নিউক্লিয়ার (পরমাণুকেন্দ্রীন সংক্রান্ত) পদার্থবিজ্ঞানের একটি নতুন আবিষ্কার ‘Anti-matter’ বা বিপরীত-বস্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব করেছে। (সাধারণ বস্তুর পরমাণু যেমন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদির সমবায়ে তৈরি, বিপরীত বস্তুর পরমাণু তেমনি অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন ও অ্যান্টি-ইলেকট্রন বা পজিট্রনের সমবায়ে তৈরি ; এই বিপরীত বস্তুকণাদের অন্যান্য ধর্ম সাধারণ বস্তুকণাদের মতোই, শুধু তাদের বিদ্যুৎশক্তি বিপরীতধর্মী।) বস্তুকণাদের গতিবর্ধক যন্ত্রে (particle accelerators) একটি বিশেষ অবস্থায় এদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বিপরীত-বস্তু সাধারণ বস্তুর সান্নিধ্যে এলেই একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে বসবে (annihilation)। অথচ এরা যে সামগ্রিক বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত তাতে সন্দেহ নেই এবং মহাবিশ্বে এরকম বহু তারাজগতের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়, যারা গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বিপরীত-বস্তুর সমবায়ে। তার মানে এই বিপরীত-বস্তু কোথাও না কোথাও সৃষ্টি লাভ করে চলেছে। এ যেমন একদিকে steady-state তত্ত্বের অনুকূলে মত প্রকাশ করছে, তেমনি ‘বিবর্তন-তত্ত্বে’র ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ সমস্যা উত্থাপন করেছে। ‘প্রাথমিক পরমাণু’ থেকেই যদি মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তার মধ্যে সমগ্র বস্তু ও বিপরীত-বস্তু একই সঙ্গে থাকার কথা। অথচ সেক্ষেত্রে তারা একে অপরকে ধ্বংস করে বসত। বিবর্তনতত্ত্বের কয়েকজন সমর্থক অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।

পাঠক অধ্যাপক লভেলের বইখানা থেকে বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত সহজ ও সুখপাঠ্য বর্ণনা লাভ করবেন। জগজিত সিং-এর বইতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। নক্ষত্রজগতের বিবর্তন, গ্রহজগতের সৃষ্টি ও মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি একটু জটিল হলেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচনা করেছেন। একজন ভারতীয় যে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কতখানি নিপুণ লেখনী ধারণ করতে পারেন, শুধু সেটুকু জানার জন্যেই এই বইখানা পড়া উচিত।

শান্তিময় রায়

বিপ্লববাদের আদি ইতিহাস

সাম্প্রতিক কালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ইতিহাস প্রণয়ন আরম্ভ হয়েছে। সরকারি বেসরকারি গবেষকরা বিষয়টি নানাদিক থেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবী দলগুলির ভূমিকা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিশেষ কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা হয় নি। অনেকে এই বিষয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন; (সুপ্রকাশ রায় রচিত—'ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস') বিষয়টি কীভাবে দাঁড় করানো যায় এই নিয়ে আলোচনাও করেছেন। এখানে বিপ্লবী কথাটা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সমজাতীয় কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের উচ্ছেদকল্পে সচেষ্ট হয়েছেন—সেই সব প্রচেষ্টাকে এখানে বিপ্লবী প্রচেষ্টা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ-শাসক এই কর্মপ্রচেষ্টাকে সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করেছিল। এই থেকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কথাটা সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। ইতিহাসবিজ্ঞানে বিপ্লববাদ কথাটা অবশ্য আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে। তথ্যের প্রাচুর্য এত যে এইগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে কোনো কিছু দাঁড় করানো খুব কঠিন কাজ। যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে বিপ্লবীদের লিখিত স্মৃতিকথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। উল্লেখযোগ্য স্মৃতিকথার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি মনে রাখার মতো: অরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী', উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা', ডঃ ভূপেন দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন', সতীশ পাকড়াশীর 'অগ্নিযুগের কথা' প্রভৃতি। কিন্তু এই স্মৃতিকথাগুলির উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করার অসুবিধা আছে।

(১) **বিপ্লবীজীবন স্মৃতিকথা**—ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। (২) **জেলে ত্রিশ বছর ও স্বাধীনতাসংগ্রাম**—ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী।

অনেক সময় এগুলি পরস্পরবিরোধী ও অতিরঞ্জিত হওয়াতে গবেষণার পক্ষে অযোগ্যপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই আশা করেছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশ বিভাগের গোপন রিপোর্টগুলি হয়তো-বা এই সমস্যার খানিকটা সমাধান দিতে পারবে।

কিন্তু সেই দিক থেকেও নিরুৎসাহ হবার কারণ ঘটেছে। খবর নিয়ে জানা গেল যে পশ্চিম বাংলায় রক্ষিত পুলিশের অনেক মূল্যবান গোপনীয় দলিল-দস্তাবেজ '৪৭ সালের অগাস্ট মাসের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় দপ্তরের গোপন মহাফেজখানা উৎসাহী গবেষকদের কাছে প্রায় দুর্ভেদ্য। লালফিতার বজ্রআঁটুনি ও আমলাতান্ত্রিক মানহানিকর আচরণ—অনেক গবেষককে এই দিক থেকে নিরুৎসাহ করে। দু-একজন ভাগ্যবানের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই মূল্যবান উপাদান বাদ দিলে বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথাগুলির তাৎপর্যও কিছু কম নয়। যদিও বিদ্বজ্জনের মনোভাব এই স্মৃতিকথাগুলি সম্পর্কে অনুকূল নয়—তবুও এইগুলিকে তুলনামূলকভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নিশ্চয়ই মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনেক বিখ্যাত বিপ্লবীই স্মৃতিকথা লিখেছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগই ইতিহাস রচনার দিক থেকে অযোগ্য। অনেকগুলির লেখার ধরন রম্যরচনামূলক—আবার কোনো কোনো স্মৃতিকথার অংশবিশেষ ইতিহাস রচনার দিক থেকে উপযুক্ত হতে পারে। যেমন—ডঃ ভূপেন দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন', সতীশ পাকড়াশীর 'অগ্নিযুগের কথা' ইত্যাদি। শ্রীঅরবিন্দ ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন ঘোষের স্মৃতিকথায় বিপ্লববাদের আদি যুগের অনেক টুকরো কাহিনী এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে। বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমি ও গুপ্ত সমিতির জন্মকাহিনী এই স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করে লেখা যায় না। কারাজীবনের লাঞ্ছনা কত নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্বিকার ভাবে আত্মস্থ করা যায় তার সাক্ষ্য মিলবে এর পাতায় পাতায়। ভারতবন্ধু জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতার বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে এই স্মৃতিকথার মূল্য সমধিক।

সাম্প্রতিক কালে দুটি বিখ্যাত বিপ্লবীর স্মৃতিকথা ডঃ যাদুগোপাল

মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' ও ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী রচিত 'জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম' বাঙালী পাঠক সমাজের নিকটে পরিবেশিত হয়েছে। যদিও যতখানি সমাদৃত হওয়া উচিত ছিল ততখানি হয় নি, তবুও এই গ্রন্থ দুটি বিপ্লববাদের ইতিহাস-রচনায় নানা কারণে নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে।

প্রথমত, দুজন রচয়িতাই বাংলার দুটি প্রখ্যাত বিপ্লবী দলের অবিসম্বাদী নেতা। এই দল দুটি হচ্ছে অনুশীলন ও যুগান্তর। প্রায় একই সময়ে এঁরা দুজনেই দলের নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ চক্রের মধ্যে স্থানলাভ করেন।

দ্বিতীয়ত, এঁরা দুজনেই বাংলা দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, সততা ও স্থিতধীর জন্য সর্বজনীন শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রারম্ভিক কাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী এঁরা বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর ছাপ রেখে গিয়েছেন।

তৃতীয়ত, এঁরা দুজনেই স্বল্পবাক, প্রচারবিমুখ, আত্মঘোষণায় অপারগ ও নিস্পৃহ ঔদার্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। জাহির করা এঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আবার, ছোট্ট ঘটনার মধ্যে তাৎপর্য অনুসন্ধানে এঁদের দক্ষতা স্বভাবজাত! এঁরা ঘটনাকে যেমন ভাবে দেখেছেন তেমনি ভাবে এঁকে রেখেছেন। স্থান বিশেষে হয়তো এঁদের ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটেছে। কিন্তু এটা স্মৃতিকথায় না হয়ে পারে না। স্মৃতিকথা এ না হলে অসার, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। স্মৃতিকথা ইতিহাস নয়।

অনেকে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রারম্ভকালকে পলাশী যুদ্ধের দশ বৎসর পর নন্দকুমার ও জগমোহন দত্তের ফাঁসি থেকে আরম্ভ করতে চেয়েছেন। ডঃ দত্ত তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে লিখেছেন যে "নন্দকুমারের সময় হইতে ভারত বিদেশী কবলমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।" ডঃ মুখোপাধ্যায় কিন্তু ভিন্ন মতের আভাস দিয়েছেন। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, চুয়ার, কোল, সাঁওতাল, পাইক, সর্বশেষে সিপাহীবিদ্রোহে এই প্রথম সংগ্রামের যবনিকা পড়ে। ঐ কারণে ডঃ দত্ত তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম'। যদিও ডঃ দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদী বিশ্লেষণী-পদ্ধতি, তবুও তাঁর এই মত আধুনিক ইতিহাসে বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং এই দিক থেকে ডঃ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকা ও যে সময়-বিভাগ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে

যুক্তিসঙ্গত। তিনি লিখেছেন: "ইংরেজ আমলে যে আন্দোলন হয় তার বিকাশ তিন ধাপে দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রচেষ্টায় সর্বত্র বাধা দিয়ে আসা হয়েছে। তাকে সহজে কোথাও বসতে দেওয়া হয় নি। ১৭৭২-১৮৫৪ সাল এইভাবে যায়। তারপর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ১৮৫৫-১৯০৪ সাল অবধি। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে বা নতুন আপদকে যেখানে পারা যায় সেখানে স্থানভ্রষ্ট করে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। তারপর এল তৃতীয় স্তর। ইংরেজ রাজ্যকে অস্তগত করে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ১৯০৫-১৯৪৪ অবধি তার সময়।"

বিপ্লবী আন্দোলনে পটভূমি রচনায় ডঃ দত্তের গ্রন্থে দু-একটি মূল্যবান তথ্য থাকলেও (যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক সহানুভূতি "বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি স্থাপনায় ছিল") সুপরিকল্পিত ভাবে তিনি এর কোনো সামাজিক বিশ্লেষণ দেন নি। কিন্তু ডঃ মুখার্জি পরিকল্পনাবিহীন বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এক বিশেষ পটভূমিকায় বিপ্লবী আন্দোলনকে যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "কর্নওয়ালিসের সময় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমাজে নতুন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকের উদ্ভব হয়। এই জমিদাররা মধ্যসত্ব হল। তারপর ১৮৩৩ সালে ইংরেজদের জমিজিরাৎ খরিদ করে সম্পত্তির মালিকানির অধিকার দেওয়া হয়। তাতে আরও গোলযোগ সৃষ্টি হল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তারতম্য সমাজে এল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবার প্রকৃত সুবিস্তৃত প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে গেল। পরে অবশ্য এর ফলে দেশে এল নবজাগরণ। ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে তাদের তৈরি বুদ্ধিজীবীদের মনান্তর, মতান্তর ও সংঘর্ষ ক্রমেই বেড়ে চলল।" তিনি দেখিয়েছেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলাবিজয়ের পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লুঠতরাজের ফলে এল মন্বন্তর। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৮০৬ সালে এক হাজার পঁচাশী কোটি টাকা খাজনা আদায়। পূর্বে ত্রিশ বছরে ঐ পরিমাণ টাকা বিলাতে যায়। "এর ফল এই দাঁড়াল যে, ভারতের লোক শিল্পচ্যুত হয়ে ক্রমেই জমিতে চাষীর সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হল। পলাশী যুদ্ধের পর মন্বন্তর, কুশাসন, ভূমি-বন্টনের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে সমাজে ওলটপালট আসে।"

"আর্থিক ক্ষতি, সমাজে অসম্মান, রাজনীতির আসনে অনাদর, কৃষ্টি বা ধর্মের আসনে ঘৃণার বা তাচ্ছিল্যের বর্ষণ—জনমনকে চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও মত্ত করে তুলল। বিপ্লবের জন্ম হল এবং কলেবর বৃদ্ধি হতে লাগল!"

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে-ভাবে নতুন শক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তার পূর্বাভাস মিলবে ডঃ মুখার্জির এই ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনায়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই আসে নীল আন্দোলন। "পঞ্চাশ লক্ষ লোক (কৃষক) একজোট হয়ে নীল-চাষ করতে অরাজী হল। দেশব্যাপী কৃষকদের প্রথম ধর্মঘট। এই আন্দোলন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে হয়।"

"১৮৬৩ সালে ওহাবী আন্দোলনের ইংরেজবিদ্বেষী রূপ বিশেষ ভাবে দেখা যায়।" "১৮৬৫ সালে পাঞ্জাবে 'কুকা' আন্দোলন। এই নিরস্ত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন বাবা রামসিংহ।" "১৮৬৮ বীটন সভায় তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী ইংরেজকে ভারত ছাড়ার কথা বলেন।" ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনের ভাব স্বদেশবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বিশেষ চেষ্টা হয়।

১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সুরেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের যুগ। সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল —বঙ্কিমবাবু কর্নেল ডকিন নামে গোরা সৈনিকের হাতে অপমানিত হলেন। তিনি ইংরেজ আমলের বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৭২-৭৩ জমিদাররা অতিরিক্ত কর বসায় এবং প্রজাদের জর্জরিত করে। "তার ফলে পাবনায় ভীষণ প্রজা বিদ্রোহ হয়। ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে ছাত্র আন্দোলন সুরু করেন—এবং প্রথম ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়—। ১৮৭৬ খৃঃ রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন হয়। ১৮৭৮ সালে দেশী সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের আইন হল। ১৮৭৯ সালে অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হল। ১৮৮২ সালে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল আন্দোলন হয়। ১৮৮৩ সালে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে কলকাতায় নিখিল ভারতীয় এসোসিয়েসনের বৈঠক বসে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম। ১৮৮৩ সালে হাইকোর্টের "অবমাননার অছিলায় সুরেন্দ্রনাথের ছমাস কারাদণ্ড হয়। দেশের জন্য এই প্রথম কারাদণ্ড। পি. মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করে আনবার চেষ্টা করেন। ১৮৯০ সালে মনিপুর বিদ্রোহের নেতা টিকেন্দ্রজিতের বীরোচিত গর্বে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ—সারা ভারতে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে—ইংরেজ রাজের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বেতনের কেরানীদের দুর্দশা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার উপর প্রতিবৎসর শত শত ছাত্র স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তোলে"। এই বিক্ষুব্ধ শিক্ষিত "ভদ্রলোক" শ্রেণীর কথাই রাওলাট কমিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্রেণীর সামাজিক উৎস ও মানসিক পরিবেশ এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করে। এই দিক থেকে গবেষণার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও এই বিশ্লেষণের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগে গুপ্ত সমিতির উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ দত্তের জবানবন্দী ডঃ মুখার্জি পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, যোগেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রথম রূপ প্রকাশ পায় 'ম্যাটসিনি ক্লাস' গঠনের মধ্য দিয়ে। ডঃ মুখার্জি এই ক্লাসের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ —অরবিন্দ-রচিত 'ভবানী মন্দির' নিয়ে বাংলা দেশে আসেন। কিন্তু 'ভবানী মন্দির' জাতীয় গোপন কেন্দ্র কখনো স্থাপন করা সম্ভব হয় না। এর পরেই প্রমথ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। 'ভবানী মন্দিরের' সম্পর্কে কোনো সমর্থনসূচক তথ্যের অভাব আছে। তবে দুমকায় রোহিনী পাহাড়ের কেন্দ্র ও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনায় 'ভবানী মন্দিরে'র সুনিশ্চিত প্রভাব প্রতীয়মান হয়। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনকালে বৈপ্লবিক পার্টির প্রথম সম্মেলন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে আহূত হয় বলে কোনো কোনো মহল দাবী করেন। এর সভাপতিত্ব করেন প্রমথনাথ মিত্র। প্রতিটি জিলা হতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র সতীশ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, নিরালম্ব স্বামী প্রভৃতি কয়েকজন প্রথম গুপ্তসমিতি গঠন করেন। বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর মতে—বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের প্রেরণায় এই দলের নাম দেওয়া হয় 'অনুশীলন'। অনুশীলনই বাংলার প্রথম বিপ্লবী দল। ডঃ দত্ত ও ডাঃ মুখার্জির মতে বাংলা দেশের পূর্বে পূর্বভারতে মহারাষ্ট্রে সর্বপ্রথম বিপ্লববাদের বীজ

রোপিত হয়। তিনি বলেছেন "বিপ্লবী বর্ত্মের আগুন মহারাষ্ট্র থেকে আসে বাংলায়, বাংলা থেকে যায় পাঞ্জাবে।…পুনার ঠাকুর সাহেব এর প্রতিষ্ঠাতা। অরবিন্দ তাঁর কাছে দীক্ষিত হন।"

বালগঙ্গাধর তিলক বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করেন। পুনার ঠাকুর সাহেব ও চিতপাবন পরিবারের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় মহারাষ্ট্রে প্রথম গুপ্ত সমিতির উদ্বোধন করেন। এঁদের নেতৃত্বে ১৮৯৮ সালে প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডর্স্টকে হত্যা করা হয় (১৮৯৮ সালে), (১৯০২ থেকে ১৯০৫)। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ ভগিনী নিবেদিতা ইউরোপীয় বিপ্লবী ভাবধারায় প্রথম প্রেরণা লাভ করেন। বিশেষ করে ভগিনী নিবেদিতা ইউরোপীয় বিপ্লবী কুলতিলক ক্রপটকিনের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিতা ছিলেন। তাছাড়া আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে, ভারতের বিপ্লববাদের পথিকৃৎ-এর মধ্যে একজন রূপে স্থান লাভ করেছেন। রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে যে পশ্চিমী বিপ্লবী চিন্তার ধারা ভারতের বিশেষ করে বাংলার ভাবজগতকে আলোড়িত করেছিল—তারই এক নতুন অধ্যায় সুরু হল ১৮৯৩ সালের পর থেকে। ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ভাবের আদানপ্রদান এই সময়ে সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। ভারতের বিপ্লবী চিন্তার মধ্যে উগ্র ভারতীয়তা ও বিশ্বজনীনতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারসাম্য—উগ্র ভারতীয়তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। ডঃ মুখোপাধ্যায় এই সমস্যাটির গুরুত্ব না দিয়ে একটি গুরুতর সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। 'বিপ্লবী' ত্রৈলক্য চক্রবর্তীর রাজনৈতিক মতামত হিন্দুধর্মের প্রচ্ছায়ায় আবৃত। এই দিক থেকে ডঃ দত্তের মত অতি সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন "বিপ্লববাদ ধর্মের আকার ধারন করে" মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব, বাংলায় শিবাজী উৎসব, গুপ্তসমিতি সভ্যদের দীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মাচার দ্বারা প্রভাবান্বিত। শ্রদ্ধেয় ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে এই সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি লিখেছেন যে "প্রতিজ্ঞা করণের সময় সাধারণত কোনো দেবী মন্দিরে লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে দীক্ষা দেওয়া হইত।…পুলিনবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে রমনা-সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়িতে বা বুড়া শিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন।…মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু, শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই

হাতে প্রতিজ্ঞাপত্র ধরিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতেন। আমি বাস্তা ডাকাতির পূর্বে পুলিনবাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি।"

রুশিয়ার নিহিলিস্ট ভাবধারা বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' আদর্শ ও ধ্যান ধারণা অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-জনিত প্রচণ্ড বিক্ষোভে "চন্দ্রকলার ন্যায় এই দল ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল।"

এই একমাত্র দলের প্রচারপত্র হিসেবে ছিল 'যুগান্তর'। ১৯০৬ সালে সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদ-পদ্ধতি নিয়ে মতান্তর হয়। "এখনই রণংদেহি" নিয়ে বারীনবাবুদের সঙ্গে মিত্তির সাহেব একমত হতে পারেন নি। তিনি আরও ভালো করে সংগঠন গড়ে তোলা ও সুদূরবিস্তারী করার পক্ষে ছিলেন। ১৯০৭ সাল থেকে বারীনবাবু আলাদা করে নিজের একটি গ্রুপ বা দল গড়ে তোলেন। "১৯০৭ সালের আগষ্টে বন্দেমাতরম্ কাগজে বিবৃতি দিয়ে বারীনবাবুরা মুরারী পুকুর বাগানে মারণাস্ত্র তৈরির জন্য আলাদা হয়ে রইলেন। তাঁরা এই সময় যুগান্তর কাগজ চালনার জন্য বিশেষ কিছু করতেন না। কবিরাজ অনাথ রায়, অতীন বসু, নরেন শেঠ প্রভৃতির সাহায্যে এবং কিরণ মুখোপাধ্যায়, নিখিল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত প্রভৃতির কর্মশক্তিতে কাগজ চলতে লাগল। এঁদের তখন কোনো কোনো লোক বলত যুগান্তরওলা বা যুগান্তরের লোক। ঠিক ১৯১০ সালে সরকারি দপ্তরে 'যুগান্তর' গ্রুপ নামটা পাওয়া যায়। 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' মামলায় সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করা হয়।"

ডঃ দত্ত দাবি করেছেন যে যুগান্তর নাম তাঁহার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করে তিনি এই নাম নির্ধারিত করেছিলেন। এই নামটি তিনি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস থেকে ধার করেছেন।

ডঃ দত্ত লিখেছেন: "যুগান্তরের পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহাই তাঁহাদের কাগজ। এই সময়ে যাঁহারা পি. মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইতেন তাঁহারা একদল হইলেন; তাছাড়া বঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কার্য করিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথমে দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও তাহাদের

শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি অধীন ছিল; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম করিতেন। এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশি ছিল। অথচ বাৎসরিক কনফারেন্সে সকলেই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে মিলিতাম।"

প্রখ্যাত প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে ১৯১০ সালে মৈমনসিংহে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর দল নিজেদের যুগান্তর আখ্যা দেন।

ডঃ মুখার্জির মতে "সত্যিই এরকম কোনো গ্রুপভাবে দল ছিল না।" যুগান্তর কাগজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ডঃ দত্তের নাম করেন নি। তিনি বলেছেন যে "সত্যি বোমা পিস্তলের ব্যাপার নিয়ে ডুবে থাকার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার জন্য গোড়ায় যুগান্তরের স্থাপয়িতা ও পরিচালকরা ১৯০৮ সালে যে বড় মামলায় পড়লেন তার নাম ছিল 'আলিপুর বোমা মামলা'। সে সময় 'যুগান্তর গ্রুপ' নামে কাউকে আদালতের কাঠগড়ায় দেখা যায় না। কিন্তু ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্রের সময় আসামীর মধ্যে ছিলেন তারানাথ রায় চৌধুরী, কেশব দে। এঁরা সরাসরি যুগান্তর কাগজের শেষদিককার লোক। আসলে 'যুগান্তর' দলের স্থাপয়িতা অরবিন্দ-বারীন্দ্র প্রমুখ। অবশ্য এই নাম নিয়ে দল তাঁরাও করেন নি। ইতিহাসের গতিতে ১৯১৫ সালের পর এই নাম এসে যায়।"

১৯৪৫ সালে বাংলার গভর্ণর কেসি তদানীন্তন বড়লাট ওয়াভেল-কে এই দল সম্পর্কে যে গোপন দলিল পাঠিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ এইরূপ "বারীন্দ্র ঘোষ ও আরও জনকয়েক মিলিত হইয়া 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া হিন্দু যুবকদের আধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার শেখাতে থাকেন। তাঁরা প্রচার করিতে লাগিলেন—বৃটিশ এদেশে শাসন করছে ছল আর বলের সাহায্যে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই যুগান্তর দল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সংগঠনশীল সমিতিতে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে এরূপ বাছা বাছা তীক্ষ্ণধী যুবক দেখা যায় না। এই দলের মধ্যেই ছিলেন বৃটেনের সত্যকারের দুর্জয় শত্রু।"

বৈপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী দাবি করেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের

পূর্ব পর্যন্ত অনুশীলন সমিতিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেটা আইনগতভাবে সঠিক। কারণ যুগান্তরের প্রায় সব সভ্যই অনুশীলন দলের থেকে উদ্ভূত। এবং সরকারি ভাবে যুগান্তরের স্বীকৃতি আসে অনেক পরে। কিন্তু আইনের কথা দিয়ে ইতিহাস বিচার হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনুশীলন সমিতির মধ্যে যুগান্তর জন্মলাভ করে বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বিকেন্দ্রিক ভাবে। নিরালম্ব স্বামী ও পরে যতীন মুখার্জি এদের নেতা হন।

১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস গ্রেপ্তার হন। অনুশীলন সমিতির প্রধান সঞ্চালক পি. মিত্র এই সময়ে হঠাৎ মারা যান। ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। এর কিছু পর "ঢাকার অনুশীলন সমিতি নামটা বেজে উঠল।" এই পুনর্গঠিত অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন বিপ্লবী পুলিন দাস। ডঃ মুখার্জি এই পুনর্গঠিত সমিতি সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন: "১৯১১ সাল থেকে বাংলা দেশে বিপ্লবীদের অবসাদ ও অন্ধকারের দুর্দিনে আলো জেলে রেখেছিলেন বলে আমি নতুন গড়া অনুশীলনের প্রশংসাবাদী আরও বেশি করে।" ১৮-২৪ বছর বয়স্ক যুবক কয়েকজন হলেন এর সারথি। তাঁরা বিদ্বান ছিলেন না, অর্থসম্পন্ন ছিলেন না, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন নি, জনসমাজে অপরিচিত। কিন্তু কি প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে দেশ স্বাধীন করার নেশায় মশগুল!…নব হোতা ও উদ্গাতা মহারাজ ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, রবি সেন ও অমৃত হাজরা…বিশেষ করে নরেন সেনের মাথা ও মহারাজের উদার হৃদয় একত্র না হলে আমরা অনুশীলনকে এমন করে পেতাম না।" বাংলার লাট কেসি এদের সম্পর্কে গোপন চিঠিতে লিখেছেন: "এদের প্রধান ঘাটি ঢাকায় এবং এই সমিতি প্রদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন। ইহাদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এঁদের সভ্যও অনেক, বিভিন্ন প্রদেশে এঁদের শাখা-প্রশাখা আছে।" নব অনুশীলন স্বতন্ত্র ভাবে পরিচিত হয় তাঁদের নতুন প্রচারপত্র দিয়ে। তাঁরা কাগজের নাম রাখলেন 'স্বাধীন ভারত'।

বাংলার প্রধান দুইটি বিপ্লবী দলের আদিকালের ইতিবৃত্ত আলোচনা ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

এ সম্পর্কে আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

১৯০২-১০ সালের মধ্যে যে সব বিপ্লবী দল গড়ে উঠল তাকে দু শিবিরে ভাগ করা যায়। একটি অনুশীলন—যার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা, অপরটি সন্ধ্যা ও যুগান্তর কাগজকে কেন্দ্র করে—নাম হয় যুগান্তর দল।

"প্রথমটি ছিল সকেন্দ্রিক। দ্বিতীয়টি ছিল বিকেন্দ্রিক।" আত্মোন্নতি সমিতি (ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি) মেদিনীপুরের সত্যেন বসুর দল, মৈমনসিংহের সাধনা সমিতি, উত্তরবঙ্গের যতীন রায়ের দল, মাদারীপুরের পূর্ণ দাসের দল, বরিশালে প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর দল, চন্দননগরের মতিলাল রায়ের দল যুগান্তর দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকে। এদের সম্মিলিত নেতা ছিলেন প্রথমে অরবিন্দ ঘোষ তারপর নিরালম্ব স্বামী পরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন গুপ্ত ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী। পরে এঁরা এদের নেতৃ ভার গ্রহণ করেন। অন্যদিকে প্রমথ মিত্রের মৃত্যুর পর অনুশীলনের নেতৃত্বভার বিপ্লবী নরেন সেন ও মহারাজের স্কন্ধে অর্পিত হয়। অমৃত হাজরা ছিলেন এদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। প্রথমবার ফ্রেজার হত্যার চেষ্টা নারানগড়ে ১৯০৭— ফ্রেজার সাহেবকে দ্বিতীয়বার ওভারটুন হলে হত্যার চেষ্টা ১৯০৮—আই. বি. সাব ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জির হত্যা (১৯০৮), আলিপুর বোমা মামলা, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০), কিংসফোর্ড হত্যা মামলা, চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার চেষ্টা (১৯০৮), নরেন গোসাঁই হত্যা (১৯০৮), শামসুল আলম হত্যা (১৯১০) ইত্যাদি যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিদর্শন। অন্যদিকে (১৯০৭) এলেনকে হত্যার চেষ্টা ; নড়িয়া ডাকাতি (১৯০ বাহ্রা ডাকাতি (১৯০৮), ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০) ; রাজাবাজার বোমা মামলা ইত্যাদি অনুশীলন দলের কার্যকলাপের পরিচয় বহন করে। ১৯ সালে জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের নিম্নলিখিত দলগুলি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়—ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি।

তাহলে ১৯০২ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যেই বাংলার বিপ্লববাদের প্রথম কাণ্ডে বিপ্লবী দল গঠনের অধ্যায় শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে আরম্ভ হয় নতুন প্রস্তুতি—নতুন সংগ্রাম।

প্রদ্যোৎ গুহ

কলিকাতার আদিপর্ব

দিল্লী-লণ্ডন বা মস্কো-লেনিননগ্রাদের মতো অত পুরনো না না হলেও শহর কলকাতার বয়সও কম করে দুশো বছর হল। হঠাৎ গজানো এই শহর প্রায় নিজের খেয়াল-খুশী মতো গড়ে উঠেছে কোনো নগর পরিকল্পনাকারের অপেক্ষা না রেখে, অনেকটা যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই। দিল্লীর মতো এই শহরের পথে-ঘাটে হয়তো ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ তেমন করে ছড়ানো নেই, নেই হয়তো তেমন কোনো টুরিস্ট-আকর্ষণকারী স্থাপত্য বৈভব, এমনকি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়ন-লোভন সমারোহেরও হয়তো অভাব আছে। হয়তো কিপলিং-এর কথাই ঠিক :

Thus the midday halt of Charnok—more's the pity
Grew a city
As the fungus sprouts chaotic from its bed,
So it spread
Chance directed, chance erected, laid and built
On the silt
Palace, mire, hovel-poverty and pride
Side by side

তবু একথাও সত্য, এই শহরের অলিতে-গলিতে, প্রতি ধূলিকণায় মিশে আছে ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। সে ইতিহাস ইংরেজ আগমন ও সাম্রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস, সে ইতিহাস সাম্রাজ্যবিস্তারের অভিঘাতে ভারতীয় সামাজিক অচলায়তন ভেঙে পড়ার ইতিহাস, সে ইতিহাস আবার বাঙলা তথা ভারতের নবজাগৃতিরও ইতিহাস এবং গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস তো বটেই। দুঃখের বিষয় যে শহর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

টাউন কলিকাতার কড়চা ঃ বিনয় ঘোষ। বিহার সাহিত্যভবন। ছ টাকা।
সুতানুটি সমাচার ঃ বিনয় ঘোষ। বাক-সাহিত্য। বারো টাকা।

দোলনা এবং গোরস্থান—সেই শহরের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস অদ্যাবধি লেখা হল না। রম্যরচনা গ্রন্থে অবশ্য এ-বিষয়ে দু-একটি লেখা হয়েছে কিন্তু তা থেকে আমরা জানতে পারি না কী করে সত্য হয়ে উঠল কিপলিং-এর এই বর্ণনা :

Once two-hundred years ago the traders came meek and tame
Where his timid foot first halted there he stayed
        Till mere trade
Grew to Empire and he sent his armies forth
        South and north
Till the country from Peshwar to Ceylon
        Was his own.

জানতে পারি না, কারা এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা, কিভাবে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, কিভাবে প্রভাবিত করেছে অপরের জীবনযাত্রা এবং এই শহরের ব্যক্তিত্ব কতটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জানতে পারি না, সাম্রাজ্যের যারা জনক, প্রতিপালক, নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তারাই আবার কী ভাবে সৃষ্টি করেছে তাদের গোরকুণদেরও, কেমন করে তারা গোকুলে বেড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত "পেশওয়ার থেকে সিংহল' অব্দি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপর টেনে দিয়েছে যবনিকা। অথচ উপকরণের কিন্তু অভাব ছিল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তো চলত দলিল-দস্তাবেজের উপরই। তদুপরি সেকালের সাহেব-বিবিরাও স্মৃতিকথা কম লিখে যান নি। এমন কি 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তেও সেকালের সামাজিক জীবনের প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায়। এই সব দলিল-দস্তাবেজ স্মৃতিকথা ইত্যাদির সাহায্যে কলকাতার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা কঠিন ছিল না। এবং শ্রীবিনয় ঘোষ একাজ অনায়াসে করতে পারতেন।

কিন্তু সে কাজে এখনও হাত না দিলেও, বিনয়বাবু তাঁর কিছু টুকরো লেখায় শহর কলকাতার আদি ইতিহাস এবং সেকালের জীবনযাত্রার উপর কৌতূহলোদ্দীপক আলো ফেলেছেন। এমনি কিছু টুকরো লেখাই সংকলিত হয়েছে 'টাউন কলকাতার কড়চা' গ্রন্থে। সবশুদ্ধ ন'টি রচনা আছে 'টাউন কলকাতার কড়চা'য়। প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রের তাগিদে রচিত হলেও তার কিছু ছাপ অবশ্যম্ভাবীভাবেই পড়েছে এগুলির উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও

তথ্য সমাবেশে, দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে প্রবন্ধগুলি সাংবাদিকতার স্তর উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, প্রবন্ধগুলি শুধু অলস কৌতূহল মেটাবার জন্যই রচিত নয়, এগুলি চিন্তার খোরাক জোগায়, নতুন গবেষণার দিগন্ত নির্দেশ করে। বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাববশত এখানে শুধু গ্রন্থসূচী উদ্বৃত করছি :

> ট্যাভার্ণ ও কফি হাউস। সাহেব নবাবদের টাউন। নতুন বাঙালী বড়লোক। পাল্কি ও ল্যাণ্ডোর যুগ। ক্রীতদাস ও কুলিমজুর। নতুন শহরে পুরাতন ভৃত্য। ডুয়েল। সেদিনের ইংরেজ বিচারক। মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্য।

এই সূচী থেকেই আলোচিত বিষয়ের বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে।

কিন্তু স্থানাভাবের অজুহাতে দুটি প্রবন্ধের অনুল্লেখ তবু অসমীচীন হবে। সে প্রবন্ধ দুটি হল : 'নতুন বাঙালী বড়লোক' ও 'মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্য'। প্রথম প্রবন্ধটিতে সেকালের কলকাতার কয়েকটি ধনাঢ্য পরিবারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, দেখান হয়েছে কী ভাবে তাঁরা প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন এবং কী ভাবে তার অপব্যয় করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সেকালে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বলতে যাদের বোঝাত—সরকারবাবু, কেরানিবাবু, মুহুরি ও বুব্বুলিয়া, চীনাবাজারের দোকানদার ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সকলেরই জানা আছে উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ মধ্যবিত্ত-ভিত্তিক। মধ্যশ্রেণীর দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা, সীমাবদ্ধতা এই নবজাগৃতিতে প্রতিফলিত। বাংলার নবজাগরণ কেন ইওরোপের রেনেসাঁসের মতো প্রাণবন্ত হয় নি, কেন তা অত সুদূরপ্রসারী হয় নি—এই প্রবন্ধ দুটিতে সে প্রশ্নের কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে। যে বাঙালী এককালে সারা ভারতের চিন্তানায়ক ছিল সে কেন জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়ল—এ-প্রবন্ধ দুটিতে তারও কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

বিনয়বাবু লিখেছেন :

"আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বাঙালীরা উদ্যোগী হয়ে সামাজিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, ইতিহাসে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই অগ্রগতির ধারা যে নিরবচ্ছিন্ন ছিল না, এবং পদে পদে বিপরীত পশ্চাদ্‌গতির ধারার আঘাতে তা যে ব্যাহত হয়েছে, উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাসের বিস্ময়কর উত্থান ও

পতন তার প্রমাণ। সেইজন্য প্রশ্ন জাগে মনে যে, বাঙালীর রক্ষণশীলতাই আসল জাতীয় চরিত্র কিনা, এবং তার প্রগতিশীলতা নকল-নবীশের সাময়িক উচ্ছ্বাসপ্রবণতার নামান্তর কি না! একথাও মনে হয়, যে-জাতি গত দু'শ বছর ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেকালের জমিদার ও সুদখোর মহাজনের মনোবৃত্তি বর্জন করতে পারে নি, সামাজিক ক্ষেত্রে তার সত্যিকার প্রগতিশীল মনোভাব থাকতে পারে কি না!…আজকের বাংলার আর্থিক সংকট ও চাকুরিগত নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় মনোভাবের জন্য এই রক্ষণশীলতা কতখানি দায়ী তাও চিন্তার বিষয়! তা যদি হয়, তা হলে আধুনিক যুগের বাঙালী বড়লোকদের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ধারা থেকে চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে বেশী।"

বিনয়বাবুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকে হয়তো একমত হবেন না, তবু কথাগুলি ভেবে দেখার মতো তাতে সন্দেহ নেই।

'সুতানুটি সমাচার' মৌলিক গ্রন্থ নয়। উইলিয়ম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস ও ভিকতর জ্যাকামোর স্মৃতিকথা ও পত্রগুচ্ছের নির্বাচিত অংশের সংকলন এটি। সংকলন ও বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীবিনয় ঘোষ। তদুপরি তিনি একটি তথ্যবহুল ভূমিকাও যোগ করেছেন।

উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথা তথ্যের একটি স্বর্ণখনি বিশেষ। বড় বড় চারখণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য। এমনকি একখণ্ডে প্রকাশিত নির্বাচিত অংশের সংকলনটিও এদেশের ক্রেতাদের পকেটের তুলনায় সুলভ নয়। বিনয়বাবু বাংলা তরজমায় এই আকর গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে পরিবেশন করে কলকাতার ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

উইলিয়ম হিকি বাংলাদেশে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দে। তিনি ছিলেন তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্নি। ১৭৭৭ সন থেকে ১৮০৮ সন পর্যন্ত, মাঝে দু-একবার স্বদেশে যাওয়া ছাড়া, হিকি প্রায় একটানা কলকাতা শহরে বাস করেন। তিনি ছিলেন একান্তভাবে সামাজিক মানুষ—সবকালের ইওরোপীয়ান তো বটেই, এদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন জীবনরসিক। ল্যাটিন

বাড়ির ভোজসভা, জজের বাড়ির খানাপিনা থেকে শুরু করে ট্যাভার্ন-এর হৈ-হল্লা, বাগান-বাড়ির সুরা নারীবিলাস সবেতেই ছিল তাঁর সমান আসক্তি। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাই ছিল বিচিত্র। তাঁর যেমন দেখার চোখ ছিল, তেমনি ছিল লেখার কলম। বিনয়বাবু ঠিকই লিখেছেন:

"জীবন দিয়ে জীবন দেখার এই ইচ্ছা ও আগ্রহের জন্য তাঁর জীবনস্মৃতির তথ্যগুলি আজও তপ্ত রয়েছে, কালের শীতল হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তাঁর বিবৃত লোকচরিত্রগুলি আজও এত জীবন্ত যে তাদের চলাফেরা, কথাবার্তার পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায়।"

কিছু উদাহরণ দিতে পারলে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হত। সে ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু স্থানাভাববশত সে লোভ সংবরণ করতে হল।

শ্রীমতী এলিজাবেথ ফে'র স্বামী ছিলেন একজন অ্যাডভোকেট। স্বামীর সঙ্গেই তিনি কলকাতা এসেছিলেন ১৮৭০ সালে। তাঁর জীবনের মোট ৩৬ বছরের মধ্যে ২৪ বছরই কেটেছে এদেশে। ১৮১৬ সালে এই কলকাতা শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস কলকাতা শহরে এসেছিলেন ১৮২২ সালের নভেম্বর মাসে। ইংলণ্ড থেকে তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং নানা দেশ ঘুরে শেষে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। তখন রাজা রামমোহন জীবিত। শ্রীমতী পার্কসের সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতায় রামমোহনকে দেখার এবং তাঁর বাড়িতে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার। শ্রীমতী পার্কস তাঁর স্মৃতিকথায় সে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখানে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

"একদিন এক ধনিক সম্ভ্রান্ত বাঙালীবাবুর বাড়ি ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবুর নাম রামমোহন রায়। বেশ বড় চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বাড়ি, ভোজের দিন নানাবর্ণের আলো দিয়ে সাজান হয়েছিল। চমৎকার আতসবাজীর খেলাও হয়েছিল সেদিন। আলোয় আলোকিত হয়েছিল তাঁর বাড়ি।

…বাড়ির ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র সাজানো, এবং সবই ইয়োরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ির মালিক হলেন বাঙালীবাবু (রামমোহন রায়)।"

হিকির মতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণশক্তি এবং লিপিকুশলতা না

থাকলেও শ্রীমতী ফে ও শ্রীমতী পার্কস-এর পত্রগুচ্ছে ও স্মৃতিচারণে ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায়, যা কেবল মেয়েদের রচনাতেই পাওয়া সম্ভব। মেয়েদের রচনা বলেই এ-ছুটিতে ঘর ও ঘরকন্নার অনেক অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।

ভিকতর জ্যাকমেঁা পণ্ডিচেরীতে এসে পৌছান ১৮২৯ সালের এপ্রিল মাসে, কলকাতায় আসেন মে মাসে। তিনি ছিলেন একজন তরুণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। ফ্রান্সের 'মিউজিয়ম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'র পক্ষ থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছিল। বর্তমান সংকলনে তাঁর যে দুটি পত্রাংশ সংকলিত হয়েছে তাতে সেকালের ইওরোপীয় সমাজের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও।

'হিকি, ফে, ফ্যানি ও জ্যাকমেঁা মিলিয়ে হেস্টিংস-ফ্রান্সিসের কাল থেকে রামমোহনের কাল পর্যন্ত (১৭৭৫-১৮৩০) কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়।' 'সুতানুটি সমাচার'-এর গুরুত্ব এইখানেই। বিনয়বাবুর তরজমা খুবই সাবলীল হয়েছে, তরজমা বলে মনেই হয় না। বইটি উপন্যাসের মতো তাই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। প্রাচীন কলকাতার কিছু চিত্র এবং প্রতিকৃতি ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে। তাতে বইটির মূল্য বেড়েছে।

বিনয়বাবু লিখেছেন, "অবশ্য এছাড়াও আরও বিবরণ আছে, যেমন বিশপ হেবারের, তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জনসনের, এম্মা রবার্টস-এর এবং আরও অনেকের। জনসন ও এম্মার পর্যবেক্ষণশক্তি প্রশংসনীয়, উপাদানও তাঁদের বৃত্তান্তে যথেষ্ট আছে। কিন্তু একই কালের উপাদানের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভেবে এঁদের বাদ দিয়েছি।"

বিনয়বাবুর এই যুক্তির সঙ্গে কিন্তু একমত হতে পারলাম না। জনসনের বিবরণ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, কিন্তু এম্মা রবার্টস-এর স্মৃতিকথা দেখেছি; তা থেকে কিছু অংশ সংযোজিত হলে বইটির মূল্য বাড়ত। একটু-আধটু পুনরাবৃত্তিতে কিছু এসে যায় না বরং একের বিবরণ অপরের দ্বারা সমর্থিত হলে তা প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়। আর একটু-আধটু পুনরাবৃত্তি তো এ গ্রন্থেও আছে। আশা করব, পরবর্তী সংস্করণে অন্তত এম্মা রবার্টস-এর থেকে কিছু অংশ তিনি সংযোজিত করবেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

উৎস থেকে উজানে

অরুণ মিত্রের কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সময় এত নিবিড় সম্পৃক্ত যে তার মূল্যায়ন আমার পক্ষে একান্ত দুরূহ। কিন্তু, সেইজন্যেই হয়তো, তাঁর আপাতঐকিক কবিতার কোথাও এতটুকু যোজনা ঘটলে আমার স্নায়ুতে ধরা পড়ে। তাঁরি মতো একটি শিকড়ের অভিমানী একাকিত্বে প্রতিষ্ঠিত অমিয় চক্রবর্তী ও আলোক সরকার সম্পর্কেও আমার স্নায়ুর আগ্রহ একই রকম। যেহেতু এই তিনজনেই ক্ষণমুহূর্তের গ্লানি থেকে মুক্ত এবং গভীর অর্থে আত্মপর্যাপ্ত সেজন্যেও আমাকে এঁরা বারংবার আকর্ষণ করেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর পারমার্থিক প্রমা ও আলোক সরকারের দুর্মর বোধিচর্যা অরুণ মিত্রে নেই, কিংবা থাকলেও পড়োশির সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই নিভৃত সন্ধিৎসা তিনি প্রকাশ করতে চান না, আর সেকারণেই তাঁর মনের উপরে অবৈধভাবে হাত রাখতে না পেরে একশ্রেণীর পাঠকের অভিযোগ বাড়তে থাকে।

কিন্তু 'উৎসের দিকে' পড়তে গিয়ে সেই নালিশ যদিও বা ওঠে, 'ঘনিষ্ঠ তাপ' পড়লে উল্লিখিত পাঠকশ্রেণী এইরকম তৃপ্তিসূচক প্রশ্ন তুলতে বাধ্য : 'তবে কি অরুণ মিত্র তাঁর মনকে এই প্রথম আমাদের দেখতে দিলেন?' 'তৃপ্তিসূচক প্রশ্ন' কথাটির উপর জোর দিতে চাই, কেননা, এই পরিবর্তন কবিতার অন্তঃশরীরে কতটা প্রতিফলিত সেই নিরূপণ সম্পূর্ণ না হলে আজকের পাঠকের পক্ষে বলা কঠিন তিনি তাঁর অভ্যস্ত বৃত্তময়তা অতিক্রম করে আমাদের সবগুলি বাসনা চরিতার্থ করেছেন কিনা।

এক্ষেত্রে কবি ও পাঠক উভয়েরই সার্থকতা, কোলরিজের ভাষায়, depends on distinguishing the similar from the same. কবি নিজেই কি 'অভিন্ন' থেকে 'সমধর্মী'কে সন্তর্পণে বিবিক্ত করে নিতে পেরেছেন?

ঘনিষ্ঠ তাপ : অরুণ মিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

অরুণ মিত্র যদি প্রদর্শনপ্রবণ হতেন তাহলে এরকম একটা উত্তর খাড়া করা যেত : 'খুব সহজেই পেরেছেন, কেননা, পরিবর্তনমাত্রকেই তিনি অগ্রস্থতি বলে গণ্য করেন।' কিন্তু যেহেতু তিনি প্রতীকী কবিতার বীজমন্ত্রে সুদীক্ষিত, চমকপ্রদ পরিবর্তনকে তিনি ডরান। এই পর্যন্ত বলেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল, কারণ হেলে-আসা বিশ-শতকের দ্রবমান তুষারবেদিকায় দাঁড়িয়ে কে বলবে যে কোনো আন্দোলনের মুদ্রা কোনো কবির ললাটে বালকতিলকের মতো আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে? প্রতীকী কবিতার প্রৌঢ় পারমিতাও তো এখন পরিত্যক্ত। অথবা, অনৃত ও যথার্থ—কবিতাসংক্রান্ত সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে মিশে গিয়েই ঐ ধরনের কবিতা বেঁচে আছে হয়তো। অরুণ মিত্র সেই ফলশ্রুতিকেই নিজের ভিতরে ধারণ করেছেন।

'উৎসের দিকে' সংকলনে সমাহৃত সেই পারমিতার একটি উদাহরণ :

দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
অনুভব করলাম।

(দুপুরের সূর্য)

এই বিমগ্ন উচ্চারণের পাশে গিয়র্গ ট্রাকলের 'রাখালেরা শূন্য বনে কবর দিল সূর্যকে / একটা জেলে এসে ঠাণ্ডা দিঘিতে পাল ফেলে চাঁদটাকে তুলে আনল' অথবা অমিয় চক্রবর্তীর 'সবুজ ঘাস আর শ্যামল পাহাড় জ্বলছে দাহে/ ভাঙা বুকের ছায়াসূর্যে' প্রকাশ্যত পারম্পর্যরক্ষী। বস্তুত 'উৎসের দিকে'র অধিকাংশ স্তোত্রে যে-অনুপাতে সব-নিয়ে-এক-হয়ে-ওঠা আছে পারম্পর্যের লৌহশৃঙ্খলা সেই অনুপাতে নেই। নেই বলে ক্ষতি হয় নি নিশ্চয়ই।

কিন্তু 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র কবিতাবলীতে অরুণ মিত্র পরম্পরা রাখতে উৎসুক। পাশাপাশি দুটি নিদর্শন :

আমি গাছের রসের মতো প্রবাহিত হই
তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
জল নড়ে না একটুও
ছায়া দোলে না কোথাও
নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি।

(কয়েকটি কথা। উৎসের দিকে)

…মনে করি জলমাটির মিল
এইবার বুঝি উদ্ভাসিত হবে,
আমার নির্জন টহলে তোমার সাক্ষাৎ পাই
প্রথম পৃথিবীর মতো তুমি
জল থেকে জাগা
উর্বর আশঙ্কায় উঁচু নিচু…

(ছায়ায় আলোয় চিহ্নিত। ঘনিষ্ঠ তাপ)

দ্বিতীয় উদাহরণে একটি যুক্তিক্রমসমহিত উপপাদ্য স্থাপিত হয়েছে। বোধহয় এমন বললেও ভুল হবে না যে এই উদাহরণে একটি বক্তব্য চৈতন্যগোচর যা প্রথমটিতে নয়। 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র বেশির ভাগ কবিতায় একটা-না-একটা বক্তব্য বিন্যস্ত হয়েছে। এবং সেই কথাবস্তু বৃহত্তর মানবিকতার দিকে উন্মুখ। 'উৎসের দিকে' ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে সেই অন্তর্দৃষ্টিকোণে উপনিষণ্ণ যাকে হপকিন্সের ভাষায় Inscape বলা যায়। 'ঘনিষ্ঠ তাপ', পক্ষান্তরে, একান্ত ধ্যানন সত্ত্বেও নির্জন স্বর্লোক থেকে অবারিত মুক্তির আস্পৃহা বহন করছে। 'উৎসের দিকে'র 'আমি বন্ধু হতে চেয়েছি/তাই দেয়ালে ঘা দিয়ে কথা বলেছি / আড়ালের ওধারে / সঙ্কেত করেছি / প্রান্তর আকাশ আর শস্যের / মোহনার' ইত্যাদি আবৃত্তিতে এই মুমুক্ষার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। এখানে তারি উদ্গত অঙ্কুর :

যে বন্ধুত্ব হৃদয়ের গহনে রেখেছিলাম
তা এখন আশ্চর্য রকম প্রত্যক্ষ।

(নিস্পন্দ শিখার সামনে। ঘনিষ্ঠ তাপ)

এই স্পষ্টতার কী প্রয়োজন ছিল? প্রতিবেশ কি নমনীয় সুস্থির হয়েছে? পরিবেশের কাছে তাঁর কি রোমান্টিক প্রত্যাশা আছে কোনো? অরুণ মিত্র তাঁর সাম্প্রতিক একটি চিঠিতে যেন এই উদ্বিগ্ন অনুমিতির উত্তর দিতে গিয়েই বলেছেন :

"আমাদের বৃহৎ পারিপার্শ্বিক কখনো কি আমাদের যথেষ্ট সংবাদ দেবে? বরং ছেঁড়াখোঁড়া গলায় কথা বলে আমাদের ধ্রুব মূল্যগুলোকে উচ্চারণ করাই উচিত।"

ঘনিষ্ঠ তাপের কবিতায়-কবিতায় এই বিচ্ছিন্ন সময়ের মধ্যেও মূল্যবোধ

উচ্চারণের অক্লান্ত অনুশীলন। যেখানে সংশয় অবক্ষয় সেখানে 'যদি হঠাৎ দেখা যায় / ভয়ভাঙা সুন্দর মাটি।'

'ঘনিষ্ঠ তাপ' পড়তে-পড়তে বারবার 'লিপিকা'কে মনে পড়ল। লিপিকার শুদ্ধতম স্বপ্নার্তির পাশে আছে ঢেলে-সাজানোর তীব্র প্রবর্তনা। কখনো-কখনো দুয়ে মিলে এক :

> অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পূজোর নহবত বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্মে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা-কিছু আছে বা"
>
> (গলি)

আর, 'ঘনিষ্ঠ তাপে' :

> কিন্তু এই-ই সব নয়···সকলে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুণি ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবে। দিনের আলো ফোটার দরকার নেই, পায়ের ঠোকায় যে চকমকি জ্বলবে তাই যথেষ্ট। পাষাণে বুক বাঁধে এই গলি। তখন একে আর চেনাই যায় না।
>
> (একটি গলি)

অবশ্য, লিপিকার লিরিকখচিত গদ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাপের পার্থক্য শেষোক্তের সচেতন অনাভরণত্বে। মনুষ্যত্বের বোধ দুটি চয়নেই অনুস্যূত। কিন্তু লিপিকা—রূপকঋজু দুয়েকটি আলেখ্য বাদ দিলে—যেখানে দুঃসহ কঠিনকে কোমল করে বলেছে, ঘনিষ্ঠ তাপ তাকে বস্তুসহ বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। এক-এক জায়গায় এই বিস্ময় এতই অমোঘ যে দৈনন্দিন শব্দগুলির আভ্যন্তর প্রচণ্ড শক্তি নিরীক্ষণ করে অবাক হতে হয়। এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে 'রিকশাওয়ালা' আশ্চর্যতম। পরিচিত প্রাত্যহ-পরিবেশে নির্ভর করার মতো কয়েকটি সত্য এখনো জীবিত আছে, এবং ঐ আশ্রয়দাতা নিকট-সত্যগুলিও যে মহা-অজানাকে বহন করছে, সেই কথাটি কবিতাটিতে চূড়ান্ত গ্রন্থনা পেয়েছে।

কিন্তু এই গ্রন্থনা—যা গদ্য কবিতার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা—ঘনিষ্ঠ তাপে সর্বত্র নেই। কখনো বিবরণীজ্ঞাপনের সাংবাদিকতা কখনো-বা বিশদ উপলব্ধিকে শাদামাঠা কাঠামোয় ধরে রাখবার চেষ্টা এখানে অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে। এটা ইচ্ছাকৃত। কবিত্ব থেকে মুক্ত করে কবিতাকে নির্ভুল যাথার্থ্যে নিয়ে আসার নিরীক্ষা হিসেবে এরা স্মরণীয়। এক-একবার চিরায়ত

কমনীয়তা সেই বস্তুভাষার উপর ভর করে যে একটি নতুনতর সৌন্দর্য এনেছে তার উদাহরণ কাঁটাতার, ইষ্টিশানে, মেলায়, শরতের ভোরের সীমানায়, অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে, দগ্ধ দিনে—এই সব ক্ষেত্রে নতুনত্ব দৃঢ়পিনদ্ধ। কিন্তু অন্যত্র প্রায়শই প্রসাধনবিরূপ সমতলধর্ম। দেশজ, তদ্ভব অথবা অনাদৃত শব্দের ভিড় সেই সূত্রেই। নাহলে মন্তর, দুব্বা, সমুদ্দুর, রাত্তির, পিদ্দিম, রোশনাই প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের কোনো যুক্তি ছিল না। এই যুক্তি মেনে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায় : 'এরা কি প্রত্যহে ব্যবহার্য ?' অথবা : 'গদ্য কবিতার পক্ষে এই ধরনের ঢিলেঢালা শব্দ কি অনিবার্য ?' এ প্রশ্নের নিরসনের জন্য অরুণ মিত্রের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষায় থাকব।

'ঘনিষ্ঠ তাপ' গ্রন্থে যা পেয়েছি সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। অসামান্য নামকরণ থেকে আরম্ভ করে আগাগোড়া মানবিকতার বীণাতার বেজে উঠেছে। বাগ্মিতার বদলে সংগীতকে প্রতিদিনের অবজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িয়ে দিতে পেরেছেন বলে আমাদের অবিবেকী সময়ের মধ্যে পবিত্র ব্যতিক্রমের এই পথিককে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আর তাঁকেই তো আজ আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি যিনি আমাদের অবজ্ঞা করতে জানেন না, সৌম্য সাহস যাঁর সকল লাবণ্যের মূলধন, যিনি সমানুভবে সমস্ত মানুষ বিষয়ে অনায়াসে বলে উঠতে পারেন : 'তারা সব আমার রক্তের দোসর।'

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সাহিত্যের উপজীব্য যে মানবজীবন এবং মহৎ সাহিত্য যে মানবিক সুখ-দুঃখের গভীর রূপ—এ বিষয়ে প্রাজ্ঞেরা ঐক্যমত্যে উপনীত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকরণগত বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক চলবে এবং চলাই স্বাভাবিক প্রাণের লক্ষণ। আমার ধারণায় ঐখানেই সাহিত্যিক সৃষ্টির চাবিকাঠি নিহিত। এই বিতর্ক যেদিন শেষ হয়ে যাবে—(কোনোদিন কি হবে ?) হয়তো সেদিন সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকবে না ; ব্রহ্মপ্রাপ্তির মতো সৃষ্টিক্রিয়াশীল মনের অবস্থাও নির্বেদে পৌছবে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ বিতরণ না লোকশিক্ষা—এইটিও একটি চালু তর্ক। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানবমনের যে শিক্ষকতা করে থাকেন—প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা প্রাণাধিকা কান্তার আনন্দের ছলে উপদেশ দানের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা করেছেন। সাহিত্যপাঠে যাঁরা কেবলমাত্র আনন্দই চান—তাঁদের উদ্দেশে আধুনিক কালের সমালোচক ভ্রূকুঞ্চিত করে বলতে পারেন: "Literature is not for entertainment, but for understanding." জীবনের এই গভীর উপলব্ধির মধ্যে মানুষের শুভাশুভের সঙ্কেতও আছে। এমনকি 'সাহিত্য' এই কথাটির মধ্যেও 'হিত' শব্দটি প্রচ্ছন্ন। মৈত্রেয়ী যেমন একদা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'যা আমায় অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব ?' তাঁরই প্রতিধ্বনি করে বর্তমানকালের যন্ত্রণাজর্জর সমস্যাকুল মানুষ প্রশ্ন তুলতে পারে—'যা আমার কল্যাণ করবে না তা আমার কোন্ কাজে লাগবে ?'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী দীর্ঘ দুশো সত্তর পৃষ্ঠার গ্রন্থে সাহিত্য সংসর্গিত নানা জটিল প্রশ্নের বিচারে ও সূক্ষ্ম শিল্প-ভাবনার সমন্বয়ে সাহিত্যের কল্যাণকর প্রভাবের

সাম্প্রতিক—অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা, কলিকাতা। সাড়ে আট টাকা।

কথাও মনে রেখেছেন। তিনি নিজে বাংলাদেশের একজন অগ্রগণ্য কবি। দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যের প্রকরণগত ও শিল্পগত দুইদিক নিয়েই যথেষ্ট চিন্তা করেছেন। তাই নিছক তাত্ত্বিকের চেয়ে সাম্প্রতিক কালের শিল্প-ভাবনার একজন অংশীদারের মুখে সাহিত্যের স্বরূপের ব্যাখ্যা শোনা অধিকতর মূল্যবান।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রবীন্দ্র যুগ ও আধুনিক যুগের সেতু। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিক কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যাতা তিনিই। মনে পড়ে, তাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমাদের অমিয় আজকাল অক্সফোর্ডের কবিদের সঙ্গে খুব হব্-নব্ করছে।" সম্ভবত তিনি এলিয়ট থেকে অডেন-ডে লুইস প্রমুখ কবিদের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিলেন।

তাঁর শিল্প-স্বভাব চিরায়ত সাহিত্যের পরিমণ্ডলে লালিত। সাহিত্য তাঁর কাছে স্নেহ-প্রেম-করুণা প্রভৃতি অপরিবর্তনশীল মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে মানব হৃদয়ের আবেগ, আকুতি ও অনুকাঙ্খা সমূহের সুষমাবদ্ধ সংহত রূপ। কেননা সে 'বহুকালের প্রভু, দেশকালের সে বন্দী নয়।'

তাঁর নিজের কথায় "সাহিত্যের মাটি বহুযুগের পলিতে তৈরী, তবে তা দৃঢ়, তারই উপরে নতুন ভিত গড়বো। মাটির তলে আছে দান্তের হাড়, এখন তাকে হীরের হাড় বলতে পারো, উজ্জ্বল কঠিন—যদিও অদৃশ্য গ্যয়টের দূরনিবিষ্ট দৃষ্টি চূর্ণ-চূর্ণ শাশ্বত হয়ে মাটিকে হিরন্ময় করে রেখেছে।" (য়ুরোপীয় সামন্বিক সাহিত্য)

এই ঐতিহ্যচেতনাই শিল্পরুচিকে গড়ে তোলে। এই দূরনিবিষ্ট দৃষ্টি কাল থেকে কালান্তরে পেরিয়ে যায় নতুনতর সৃষ্টিশীল তাগিদে, পূর্বাচার্যের সঙ্গে উত্তর-সাধকের নাড়ীর যোগকে অক্ষুণ্ণ রেখে। এই ঐতিহ্যচেতনার অর্থ যে পিছনের দিকে ফেরা নয়—সে কথা বলাই বাহুল্য।

"...দাঁড়িয়েছি একটা প্রাচীন বটচ্ছায়ায় ; পিতৃপুরুষের যুগবাহী কল্যাণ যেখানে আশ্রিত। মরুভূমিতে আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলা। কিন্তু ছায়াতপে যুগ্মবাণী শুনে যাব।" [ঐ] এরপরেই সাহিত্যে যুগ-চেতনা বা যুগধর্মপালনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"হঠাৎ দেখি যে-উপমা ব্যবহার করেছি তার মানে গেছে বদলে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোমর বেঁধে লিখছি তারও গভীরে আমার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বা আমার কালের উদ্দেশ্য, দেশ বা জাতির উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গেছে।"

(কেন লিখি)

'সাম্প্রতিক'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধমালাকে প্রধানত চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) সাহিত্যতত্ত্বমূলক (২) সাহিত্যিক ও তাঁদের শিল্প-ভাবনা সম্বন্ধীয় (৩) রবীন্দ্র বিষয়ক এবং (৪) কয়েকটি মহান চরিত্র-চিত্র। সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলীতে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী শিল্পীমানসের উপরে যুগধর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। 'শিল্পদৃষ্টি', 'কাব্যে ধারণাশক্তি', 'কাব্যাদর্শ', 'দুর্যোগের সাহিত্য', 'ইওরোপীয় সামরিক সাহিত্য', 'তেরোশ পঞ্চাশের বাংলা' প্রবন্ধসমষ্টি এই দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

> "সৌমনস্যের একটি স্বচ্ছপটে প্রাত্যহিকের যথাযথ রূপ নিরীক্ষণ করা শিল্পীর স্বধর্ম। তিনি দেখান ঘটনার আবর্ত, বিচিত্রের সংঘাত-সমস্যা অথচ স্থায়ী ভূমিকার উপরে নীলাম্বর, দৃশ্যে-অদৃশ্যে মিলিয়ে এই পার্থিব আশ্চর্যতা কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়ে এই শিল্প-ধারণা। ধ্যানের বিলীনতায় প্রত্যক্ষকে হারিয়ে যে-ধরনের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা তা নয়, অথচ কাছের অসংখ্যকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও তথ্যের বন্দীশালা বানিয়ে যে-বাস্তব তাকেও দূরে রাখা। কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু এই মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিশক্তি শিল্পীর সহজাত, অন্যের পক্ষে দুরূহ। তাই সংসারে আজ একচক্ষুর বা দিব্যচক্ষুর অত্যাচারে মানবিক শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন, প্রীতির আলোকে যে-দৃষ্টির প্রকাশ তাকেই বেঁধেছে মানুষের অতিবুদ্ধি। শিল্পীর মুক্তি যে কত বড়ো, তার সর্বত্রচারিতা বহুদর্শিতা মানুষের পারস্পরিক সভ্যতার পক্ষে একান্ত কাম্য সেই কথা দলীয় মতদ্বন্দ্বিতার দিনে বারবার অনুভব করতে হয়।" (শিল্পদৃষ্টি)
>
> "...রাষ্ট্রিকেরা যখন কম্যুনিস্ট-ফ্যাসিস্ট শুনছেন, ধার্মিকতার যাদের চিনছেন ধর্মচিহ্ন, এবং একান্ত আধ্যাত্মিক জানছেন সবটাই মায়া তখন কবির চোখ কান খোলা।" (শিল্পদৃষ্টি)

রচনার তারিখ আগের হলেও বিষয়টা সাম্প্রতিক কালের পক্ষেও মর্মান্তিক সত্য। রবীন্দ্রনাথের মুক্ত, উদার স্বচ্ছদৃষ্টিভঙ্গির যোগ্য উত্তরাধিকারীর এই উক্তির নিচে অনেকেরই ঢেঁড়া সই মিলবে।

কর্মের মূলে সর্বাঙ্গীন বোধের যে শিল্প-প্রতিভা—যথার্থ শিল্পীর তাই সকল বিস্ময়বুদ্ধির সংস্কারহীন, বিদ্বেষলেশশূন্য, আত্মপরবোধাতীত নিঃস্বার্থ আবেগ প্রকৃত শিল্পীর উপজীব্য।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী তাই মহাভারতের অর্জুনের মধ্যে প্রকৃত আর্টিস্টের সন্ধান পান। গীতার ভাষ্য বাদ দিলে সমালোচক খোলা চোখে দেখেন যে শিল্পভাবুক অর্জুন সারথি কৃষ্ণের সামনে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরাঙ্গনে প্রকৃত কবির দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। একই কালে অর্জুনের চোখে ধরা পড়েছে শূন্যতার প্রয়োগ ও পরিণাম। অর্জুন যুগ্মদৃষ্টিতে দেখেছেন স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে দোষী-নির্দোষীর অসংখ্য মিশ্রণ। সাম্রাজ্যস্পৃহায় দুই দলই সমান।

> "এমন অবস্থায় যে-কবিমানস রক্তপ্লাবনে পরাঙ্মুখ হয়ে অন্য কোনো উপায়ে মীমাংসা খোঁজে সে আগে যোদ্ধা ছিল, এখন দ্বিধাপন্ন, এতে তাকে ক্লীব বলা চলে না, চক্ষুসম্পন্ন বলতে হয়। তার প্রশ্নের জবাব কোথায়? ধর্মযুদ্ধের নামে স্ত্রীগণকে পাপলাঞ্ছনার হাতে সঁপে দিয়ে, কুল প্রদুষ্ট করে, অশুচি সংসারের "রুধিরবিদিগ্ধ" প্রলয় কলুষ রূপ বরণ করা আর যাই হোক মানবোচিত নয়।... যেখানে নিকৃষ্ট পথই খোলা রয়েছে, অন্য পথ দেখা যায় না, সেখানে অর্জুনের মতো স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিতেই মানুষের পরিচয়। সেখানে ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাই শিল্পীজনোচিত।" (শিল্পদৃষ্টি)

আত্মপর-বোধাতীত এই সমবেদনার দৃষ্টিই আধুনিক যুগের কবি উইলফ্রেড ওয়েনকেও দিয়ে 'strange meeting'-এর মতো বিশ্ববিশ্রুত মহৎ কবিতা সৃষ্টি করিয়েছে।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে উদ্দেশ্য ও মানবনীতির অপরিবর্ত স্বরূপ সাহিত্যে অভেদাত্মা হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু এরই পাশাপাশি প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে শিল্পীর চিদাকাশে আত্মগত ভাবনার যে রংরেজিনীর খেলা—তাকেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পংক্তিতে স্থান দেওয়া বিধেয়। সাহিত্যে pluralism স্বীকৃত সত্য—একথা ফিরে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

তাঁর মতে সাহিত্যের রূপ বর্ণাঢ্য কিন্তু শ্রেয়োধর্মী—সেই শ্রেয়তা সমাজের উপস্থিত ভালোমন্দের সঙ্গে সব সময় স্পষ্টত যুক্ত না হলেও।

বলাবাহুল্য শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মার্কসিস্ট নন। 'ইওরোপীয় সামরিক সাহিত্য' নিয়ে 'উড়োতর্ক' ফেঁদে তিনি প্রতিপক্ষের জবানীতে যা বলিয়েছেন, ঠিক সেই বক্তব্য কারা বলত জানি না। তবে মার্কসবাদীদের যদি তিনি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে বলব যে এতদিনের অভিজ্ঞতার ঝাড়াই-বাছাইয়ের ফলে পূর্বেকার বহু বক্তব্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁরও নিশ্চয়ই অবিদিত

নেই যে প্রশ্নসংকুল বর্তমান শতকে বহু তর্ক-বিতর্ক এমনকি সেদিনের সোভিয়েত বিমূর্ত শিল্প-বিতর্ক প্রসঙ্গেও এমন সব বহু প্রশ্ন বহু দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে সত্যের মর্মমূলে পৌছানোর চেষ্টা চলেছে। এ প্রসঙ্গে সেই আপ্তবাক্যটিও স্মরণে রাখা দরকার যে 'সত্যের চেহারা একটা মাত্রই নয়।'

তিনি বলেছেন—"অন্যায় এবং কল্যাণের একটি মহাযুদ্ধ আছে, তারই দৃষ্টি দিয়ে তলে-তলে মূল্যবোধ জাগে; পড়ো তলস্তয়-এর মহাসামরিক উপন্যাস। শেষ ক'বছর ধরে সমগ্র য়ুরোপে দৃষ্টি আঁধিয়ে এল; শিল্পের ভঙ্গিতে গড়া হচ্ছে রক্ত পঙ্কের পুতুল। তাতে লাল বা অন্য রঙা কামুফ্লাজের বর্ণচাতুরী। খাঁটি কম্যুনিজম্‌কে বন্ধক রেখে এই সস্তা শিল্পকে চালানো হচ্ছে এরই অনুকরণ করতে চাও কি?" (য়ুরোপীয় সামরিক সাহিত্য) এসব কথা অবশ্য বহু পূর্বের সামরিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে উঠেছিল। আসলে তাঁর মতে শিল্পসাহিত্যকে সাময়িকতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। বর্তমানের ঘটনাকেন্দ্রিক অনুপ্রেরণা লাভ করেও তাকে শাশ্বতের সার্থকতা অর্জন করতে হবে। এ-প্রস্তাবে তাঁর সঙ্গে হয়তো মার্কসবাদীরাও দ্বিমত হবেন না। এমনকি লেনিনও পুশকিন ও মায়াকোভস্কির মধ্যে প্রথমজনকেই শ্রেষ্ঠতর আসন দিলেন সে কথাও ভেবে দেখার মতো।

তাঁর মতে "কাব্যলক্ষ্মী বাস্তবী, প্রত্যক্ষদর্শনা। তিনি সাম্প্রতিকী, তাঁর অন্যমূর্তিও আছে। কিন্তু তাঁকে দেখবার আলো চাই,—সেই আলোকের আকাশ কেবলমাত্র ঘটনায় নেই।"

'কেবলমাত্র ঘটনায়' যে সেই 'আলোকের আকাশ' নেই—এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত হবেন না। কাল তাঁকে লেখায়, স্বভাবও তাঁকে লেখায়—এই দ্বৈত সত্যকেই তিনি স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রবন্ধমালায় এজরা পাউণ্ড, য়েট্‌স, জয়েস, হিন্দুস্তানের /কবি ইকবাল, বীরসিংহ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকের কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সমর্থক এই অপরাধে মার্কিন মনো[illegible] পাউণ্ডকে বন্দী করে রাখার সময় লেখক একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণে পাউণ্ড ও তাঁর কবিতার মূল স্বরটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সূত্রে সে সময় প্রকাশিত পাউণ্ডের pisan cantos নিয়ে লেখক

মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। এই কাব্য থেকে দু' একটি ছোট ছবি উদ্ধৃত করি।—

'Your eyes are like the clouds over Taishan
when some of the rain has fallen,
and half remains yet to fall.'

* * *

'Morning moon against Sunrise
like a bit of the best antient Greek Coinage.'

* * *

'When the mind swings by a grass-blade
an ants forefoot shall save you
the clover leaf smells and tastes as its flower.'

এই কবিতাই কবিকে বন্দীশালায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। শ্রীচক্রবর্তী এক জায়গায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর গীতাঞ্জলির তর্জমার মধ্যে দিয়ে, দু'চারটি ইংরেজি প্রবন্ধে ও বিশেষ করে এজরা পাউণ্ড ও য়েট্‌স্‌-এর মধ্যে দিয়ে কী ভাবে এলিয়টের উপরে ক্রিয়াশীল তা খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু অনুশীলনের বিষয়।…

…লর্কা এবং প্রাচীনতর ভালেরির শেষদিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত ত্রয়ী ইংরেজি কবির অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা কঠিন নয়।"

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথের উপরে বিদেশী কবিদের সূক্ষ্ম ও সুদূরতম প্রভাব আবিষ্কারের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে যে আন্দাজে ম্রিয়মান হতে হয়, লেখকের মন্তব্যে ততখানিই সান্ত্বনা লাভ করা যায়।

এলিয়টের ফোর কোয়ার্ট্রে টস্‌ ও কবি য়েট্‌স্‌-এর সম্বন্ধে আলোচনা দুটিও সুন্দর। য়েট্‌সের কবি-জীবনের ক্রমপরিণতির পর্যালোচনা করেছেন লেখক আলোচনা করেছেন, পাউণ্ডের প্রভাবে তাঁর রীতিবদলের কথা। পাউণ্ডের এই 'শিক্ষকতা' ছিল এলিয়টেরও সাফল্যের মূলে।

দিগ্বিজয়ী পাউণ্ড যেন নতুন নতুন পথ কেটেই ক্ষান্ত। কিন্তু এলিয়ট ও য়েট্‌স্‌-এর ঘরণী মন সময়মতো সোনালী ফসল নিজের নিজের গোলায় তুলতে সক্ষম হয়েছে।

পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক তাঁর 'জিভাগো' উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন, এ যেন "সংকীর্ণ অর্থে চৈতন্যসাধন—কেবলমাত্র যা মনস্তাত্ত্বিক, বা সৌন্দর্যপিপাসায় অবসরহীন—মানুষের পূর্ণদৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের প্রতিভা অন্যতর। অনুভূতির সূক্ষ্মতম তারে কবি কালিদাস বা শেলী ধরেছিলেন মানবচিত্তের ভবিষ্যৎ। দুঃসাধ্য জাতীয় অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়-পারগামী উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনো গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না।"

উপরন্তু এই উপন্যাসে জিভাগোর অপ্রত্যাশিত চারিত্রিক ভগ্ন বিলাসিতা লেখককে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। "একদিকে ধার্মিক গোঁড়ামি অন্যদিকে জিভাগো চরিত্র মানবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদভ্রান্ত বা ক্লান্ত ঔদাসীন্যে ক্ষয়শীল।" বিশেষত প্রেমকে রক্ষা করার মতো পৌরুষের অভাব বা ঔদাসীন্যের জন্যে জিভাগোকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর মতে, আর্টের সঙ্গে সমগ্র মানুষের এবং সমাজের যে যোগসূত্র আছে তার উজ্জ্বল পরিচয় এখানে অনুপস্থিত এবং চিত্তধর্মের অভাব সেখানে মানবধর্মের প্রকাশে বাধা দিয়েছে বলেই বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও পাস্তেরনাকের সৃষ্টি সার্থক হল না।

প্যারিসে জেমস জয়েসের সঙ্গে লেখকের আলাপচারীর বর্ণনায় জয়েসের চিন্তাশীল স্মিত ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে জয়েসের ভাষাচেতনার কৌতুককর উপভোগ্য দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন।

জয়েসীয় ভাষার কিছু উদাহরণ দিই :

Satisfiction (উপন্যাস পড়ার তৃপ্তি)

Bluey-Silver ; Rainbowl ; Silvamoonlake (দেখতে, অনুভব করতে)

Clapplause (চরম উৎসাহবাচকতায়)

Shampain (শ্যাম্পেন পানের পরের ভোরের অবস্থা ?)

এরকম 'portmanteau words' আরো আছে। যা লেখকের কাছে খ্যাপামি হতে পারে কিন্তু ঝোড়ো মেঘে সোনার পাড় বসানো। যা মনে বিদ্যুতের চমক লাগায়।

যে ক'জন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন, শ্রীচক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্বের আলোচনায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক ও শেষলেখা'র আলোচনায় অনেক মূল্যবান নতুন কথার সন্ধান পাওয়া যাবে।

এ ছাড়াও গান্ধীজীর সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ, আইনস্টাইন, য়োহান বয়ার, এইচ্. জি. ওয়েলস্ প্রমুখ মনীষী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারীর মনোরম বর্ণনায় গ্রন্থটি অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। য়োহান বয়ারের বাড়িতে অতিথি হয়ে লেখককে যেবার রাত্রি যাপন করতে হয় তখনকার একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করছি যাতে নরোয়ের ঔপন্যাসিকের অন্তর্নিহিত চরিত্রের মাধুর্য প্রতিভাত।

"আমি তার অতিথি, কোন দূরাগত সামান্য আগন্তুক, ভোরে উঠে দেখি আমার শোবার ঘরের দরজার বাহিরে তিনি অতি সন্তর্পণে আমার জুতোজোড়া রেখে যাচ্ছেন। য়ুরোপের নিয়ম, দরজার বাহিরে জুতো রেখে দিতে হয়; হোটেলের বা বাড়ির ভৃত্যরা পরিষ্কার করে তা সকালে রেখে দেয়। আমি একান্ত আশ্চর্য হয়ে কিছু বলবার পূর্বেই তিনি বললেন, আমি গরীবের ছেলে।" চরিত্র-চিত্রটি অবিস্মরণীয়। এই সেবার অর্ঘ্য, এই মানবিক করুণাই তাঁর সাহিত্যকে অপরিসীম দরদে ভরে দিয়েছে। এ ছাড়াও ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জ থেকে সেখানকার অধিবাসী ও জীবনযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত অন্নদাশঙ্করকে লেখা একটি চিঠি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধাবলী এই প্রথম একত্রিত আকারে প্রকাশিত হলো। কয়েক বছর পূর্বে 'কবিতা'য় 'শেষের কবিতার লাবণ্য' বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল মনে পড়ে। সেই আলোচনাটিও এই গ্রন্থে প্রকাশ করতে পারলে ভালো হত।

তাঁর সূক্ষ্ম ও সৎ শিল্প-ভাবনায় সমৃদ্ধ শুদ্ধ মানসিকতার সাহচর্যে স্বস্তি পাওয়া যায়। অজস্র বিষয়-বিস্তারে ও বিচিত্র আবেদনে বাংলা সাহিত্যে 'সাম্প্রতিক' সুমুদ্রিত একটি স্মরণীয় সংযোজন।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

যাঁদের জীবনের দিকে তাকিয়ে পয়লা নজরেই প্রেমে পড়া যায়, বাংলা সাহিত্যে তেমন লোকের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে স্বল্প। সেই স্বল্পের গোষ্ঠীর অবিসংবাদিত এক নায়ক নিঃসন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এক বিচিত্র মানুষ: প্রিন্সের নাতি এবং মহর্ষির ছেলে, অভিনেতা ও প্রযোজক-সংগঠক, বহুভাষাবিদ ও অনুবাদক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, হাস্যরসিক ও গীতা-অনুরাগী, সুরস্রষ্টা ও চিত্রশিল্পী, স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যঙ্গকারী এবং পরবর্তীকালে পরিপোষক, দেশহিতে উদ্যোগী কর্মযোগী এবং বৈরাগ্যে দেশত্যাগী নিভৃতবাসী, বিবিধ ব্যবসায়ে সক্রিয় এবং জমিদারি পরিচালনে তৎপর, ফিজিয়নমিতে আগ্রহী এবং ফ্রেনলজির চর্চাকারী, তাঁর বিশিষ্টতম অনুজের চোখ ফোটাবার প্রধান আলোক-উৎস।

কিন্তু হয়তো এ সবই বাহ্য। তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এ সব কিছুকে ছাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর কোনো একটি বা একাধিক পথ ধরে এগোলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গভীরতম কেন্দ্রদেশে পৌছনো যায় না। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেমে পড়া যত সহজ, তাঁকে লাভ করা তেমনি দুরূহ। তাঁর [illegible] বহুমুখী, এবং তার চেয়েও বড় কথা: তাঁর কৃতির চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব [illegible] তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর বহুমুখ কৃতিখণ্ডকে উজ্জ্বল করেও উদ্বৃত্ত অযুত [illegible] অধিকারী। সেই বহুবিচিত্র কৃতিকে ধারণ করা দুরূহ, আর ঐ অযুত [illegible] পরিচয় নেওয়া দুরূহতর।

সেই রশ্মির প্রাণোত্তাপ পেয়েছেন তাঁর নিকটস্থ ব্যক্তিরা। কয়েক [illegible] আগেও হয়তো এমন লোক ছিলেন যাঁরা সেই প্রত্যক্ষ স্মৃতির অধি[illegible] এখনও হয়তো এমন দু'এক জন আছেন যাঁরা এক-হাত-ফেরৎ পরোক্ষ [illegible] ভাণ্ডারী। দু-দিন বাদে সেই পরোক্ষ-প্রবাহও অবসিত হয়ে যাবে। [illegible]

সুশীল রায়: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু কথা গল্পের আকারে কোনো কোনো মহলে প্রচলিত, দু-দিন বাদে তা অবলুপ্ত হয়ে যাবে, অথবা প্রামাণ্যতার অভাবে পরিত্যক্ত হবে। অযুত রশ্মি ঢাকা পড়ে যাবে, পড়ে থাকবে স্বকীয় 'জীবনস্মৃতি', মন্মথনাথ ঘোষের লিখিত জীবনী এবং কয়েক খণ্ড গ্রন্থাবলী, যা সম্মিলিতভাবেও ঐ অযুত রশ্মির প্রতিনিধিত্ব করে না। এই কীর্তিখণ্ডকে নেড়ে-চেড়ে তার ওজন বুঝে নেবার চেষ্টা যে-কোনো গবেষকের প্রাথমিক কর্তব্য। সেই কাজে ভালো করে হাত পড়ল এই প্রথম। সুতরাং সুশীলবাবু ধন্যবাদার্হ। এবং এ ধন্যবাদ নিছক শুষ্ক কথায় না দিয়ে শাঁসালো আকারে দিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ডি. ফিল্-এর খেতাব দানের মাধ্যমে। কিন্তু এই সাফল্যেই যেন সুশীলবাবু আত্মতৃপ্ত হয়ে না পড়েন। তাঁর আরো একটা ধাপ যাবার আছে। জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনের ঐ অযুত-রশ্মির সমুদ্রে তাঁর অবগাহন কাম্য। এ প্রত্যাশা যে শুধু আমাদেরই তা নয়। সুশীলবাবুর থীসিসে প্রোমোটার ডঃ সুকুমার সেনও সুশীলবাবুকে সেই দুর্গম-যাত্রার আহ্বান জানিয়েছেন গ্রন্থের ভূমিকায়। ডঃ সেন বলেছেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা ও শিল্পের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে বেশি টানে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে ইচ্ছা করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমার কেমন tragic figure বলে মনে হয়। তাঁর মধ্যে যেন একটু বিষাদ ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র খেই ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন লুকিয়ে পড়লেন। সুশীলবাবু তাঁর জীবনী-সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে তৃপ্তি হল না। অনুরোধ করি, তিনি যেন আরও বছর-কয়েক গবেষণা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-মানুষটির জীবনী রচনা করেন। এ কাজে সুশীলবাবুরই অধিকার।" এই অতৃপ্তি ও অনুরোধ পাঠকদের সার্বজনীন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষাদ যদি কিছু থেকে থাকে, তা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর নয়। তিনি মাইকেল মধুসূদনের মতো উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না, স্বভাবে তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ, কিছুটা রিজার্ভ। প্রথম জীবনে তাঁকে স্বচ্ছল, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় বলেই মনে হয়—অন্তত কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দৃশ্যত তাই। কিন্তু কোথায় সেই অন্তরশায়ী গভীর বিষাদরেখা যা উভয়কে মৃত্যুর দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত করে দিল? যে-ডোর 'ভারতী'-র তোড়ার ফুলগুলিকে বেঁধে রেখেছিল, সেই ডোরের মধ্যেই চিড় খেয়ে গিয়েছিল কেমন করে? মৃত্যু আকস্মিক, কিন্তু অন্তরালে তার ক্ষেত্র-প্রস্তুতি নিঃসন্দেহে দীর্ঘকালীন। মৃত্যুর আগেই একটি

বেদনাধারা উভয়ের মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রবাহিত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেমজীবনের এই ধারা প্রায় সবটুকুই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। কাদম্বরী দেবী তাঁর জীবনে ও মরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কতখানি স্পর্শ করেছিলেন, তা আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। ইদানীং কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা সবটুকুই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বোঝবার জন্য নয়। কিন্তু এটি জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনের এমন একটি গ্রন্থি, যা মোচন না করলে তাঁর জীবনের ভেতর-মহলে ঢোকবার ছাড়পত্র পাওয়া দুরূহ। এই মৃত্যুর প্রভাব তাঁর জীবনে কতটা কীভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, তাও পুরো আমরা জানি না। শুধু জানি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথসহ ভারতী-গোষ্ঠীর সকলে 'ভারতী' বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীর পাতায় জানালেন: 'ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।' অবশ্য স্বর্ণকুমারী দেবী এই সঙ্কটকালে 'ভারতী'র হাল ধরে তাকে রক্ষা করেন। আর জানা যায় যে স্ত্রীর মৃত্যুর এক মাস চার দিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বরিশালে স্বদেশী ষ্টিমার চালাতে গিয়েছেন। আর জানা যায় যে তিনি জীবনে পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নি। এই সব ঘটনার কতটা মৃত্যুবিষাদ-প্রভাবিত, কতটা তাঁর স্বধর্ম, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

দ্বিতীয় বিস্ময়, তাঁর কর্মজীবন, বা কর্মকে অবলম্বন করে তাঁর বিশেষ মানসিকতা। তিনি অজস্র রকমের কাজে হাত দিয়েছেন, খুব জোরালোভাবেই আঁকড়ে ধরেছেন কাজগুলোকে এবং খুব দ্রুত সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু কিছুটা সফল হয়েই তা তিনি প্রায় পরিত্যাগ করেছেন, চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য বা যশের জন্য তাঁর অভীপ্সা ছিল না। বিষাদ মাত্র নয়, যেন তার চেয়েও গভীর কিছু, এক ধরনের ঔদাসীন্য তাঁর অন্তরে বাস করত। দেশহিতকর্মে তিনি বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু একদিন কলিকাতা ত্যাগ করে নিভৃতবাসী হলেন। সাহিত্যের যশ যখন তাঁর দ্বারপ্রান্তে আগত, তখন তিনি সাহিত্য থেকে প্রায় অবসর গ্রহণ করলেন। মধুসূদন বেশি দিন বাঁচলে সাহিত্যে হয়তো প্রত্যাবর্তন করতেন, এবং তাঁকে 'অলিখিত মহাকাব্যের কবি' বলে অন্তত আমরা কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছি, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহাল তবিয়তে সাতাত্তর বছর বেঁচে থেকেও কোনো পূর্ব-আগ্রহের কর্মে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন না করে আমাদের সে-সান্ত্বনা থেকেও বঞ্চিত করে রেখে গেছেন।

তৃতীয়ত, তাঁর শেষ জীবনে রাঁচির 'শান্তিধাম'-এ স্বেচ্ছা-নির্বাসন ও

বাণপ্রস্থের মূলে কি গভীর কোনো বিষাদ ছিল? যৌবনে তিনি জীবনকে এত সপ্রেম আলিঙ্গনে বেঁধেছিলেন যে বাণপ্রস্থ যেন তার সঙ্গে খাপ খায় না। মধ্য যৌবন থেকেই একটা নিঃসঙ্গতা যেন তাঁকে ঘিরে ধরছিল। কাদম্বরী দেবী নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, একটি সন্তানও তিনি রেখে যান নি, ভাই-বোনেরা স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কলকাতাতেই তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে ছিলেন। তাকেই সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে তিনি মোরাবাদী পাহাড়ে চলে গেলেন। সেখানে তিনি গীতারহস্যের অনুবাদ করেছেন, সম্পাদকদের অনুরোধে কিছু লিখেছেন এবং ভগবৎ-উপাসনা করেছেন। কিন্তু যৌবনের উত্তাপ যতই কমে যাক, তখনও স্নেহ-ভালোবাসার তৃষ্ণা তাঁর ছিল, সে-অভাব তিনি বোধ করতেন। তাঁর স্বভাব এই অভাবকে কোনো সময় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে দেয় নি। তবু দু-একটি চিঠির মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীকে একটি চিঠিতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযত নিম্ন কণ্ঠে জানিয়েছিলেন:

ভাই স্বর্ণ

তোমার আন্তরিক শুভকামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। মেজদাদা গেলেন, দিদি গেলেন, শরৎ গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা।…যতই দিন যাচ্চে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্চে, ততই স্নেহ-ভালোবাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালোবাসার মর্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

স্নেহের
নতুন দাদা

নিঃসঙ্গতা আর ঈষৎ বিষাদের ক্ষীণ একটা স্বর যেন একটু আড়াল থেকে কথা বলছে বলে মনে হয়। সেই আন্তর স্বর ভাষা পাক সুশীলবাবুর লেখনীতে—ডঃ সেনের সঙ্গে আমাদেরও এই প্রার্থনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক অবহেলিত মানুষ। সঙ্গীতে তিনি বিস্মৃত। চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে তাঁর নামোল্লেখও করা হয় না। (যেমন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত স্টাডিজ ইন্ দি বেঙ্গল রেনেসাঁস গ্রন্থে শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী বাংলা

দেশের চিত্রশিল্পে রেনেসাঁস বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামও উল্লেখ করেন নি।) নাটকের ইতিহাসগুলিতে মাত্র তাঁর এবং তাঁর নাটক-গুলির নাম খুঁজে পাওয়া যায়। বসন্ত চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত 'জীবনস্মৃতি' এবং মন্মথনাথ বসুর জীবনীর পরে তাঁর সম্পর্কে কোনো বই লিখিত হয় নি। এই বই দুটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নানা কারণে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সুশীলবাবুর বই হাতে পেয়ে যে কেউ খুশি হবেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন। সুশীলবাবু একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক। তাছাড়া বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় বহু মালমসলা তাঁর কাছে সুগম। এই সুযোগকে তিনি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকখানি ছবি এ বইয়ের সম্পদ। মন্মথনাথ ঘোষের বইতেও ছবি ছিল, কিন্তু পুরনো আমলের ব্লক এবং ছাপায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। সুশীলবাবুর বইয়ের ছবি সে দিক থেকে এক কথায় চমৎকার। পরিশিষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের একটি তালিকা করেছেন সুশীলবাবু—বিভিন্ন বইয়ের সহায়তায়। আর একটি তালিকা ছবির—বর্ষানুক্রমিক পূর্ণ তালিকা। এটি সঙ্কলনে সাহায্য করেছেন অসীমকুমার ঘোষ। ভবিষ্যতে যাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান ও ছবি নিয়ে চর্চা বা আলোচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে এই তালিকা দুটি বিশেষ মূল্যবান—প্রায় অপরিহার্য বলা চলে।

বইটির কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

(১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবহেলিত ঠিকই। কিন্তু এই জাতীয় গবেষণা-মূলক গ্রন্থের পক্ষে আক্ষেপ করেছেন লেখক অত্যন্ত বেশি।• 'লেখকের কথা' ১, ২, ৩, ৪, ৫৯, ১১৪, ১৬৫, ১৭৩ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় এই আক্ষেপ আছে।

(২) খোঁজ করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিঠি এখনও পাওয়া সম্ভব। সেগুলি সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যেতে পারে। একটা হদিশ আমি দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়নাথ পত্রাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদনার সময় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারখানি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। শুনেছি, এই পত্রে সঙ্গীত-সমাজ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কথা বলেছেন। এই পত্রের জিম্মাদার হয় সম্ভবত প্রিয়নাথ-পুত্র শ্রীপ্রমোদ সেন।

(৩) বইতে নানা জায়গায় অহেতুক পুনরুক্তি আছে। তার একটি

কারণ—অধ্যায়-পরিকল্পনার ত্রুটি। যেমন, 'সমসাময়িক সমাজ ও কাল' এবং 'সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব' নামে দুটো আলাদা অধ্যায়-এর প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ।

(৪) সমসাময়িক দেশ-কালের বিস্তৃত আলোচনা আছে বইটিতে। কিন্তু তার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংযোগ ও সম্পর্কের দিকটি খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি সর্বত্র।

(৫) অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য। অনেক নাট্যানুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙালী নাম-ধাম-পরিস্থিতির ভিত্তিতে মুক্ত ভাবানুবাদ করেছিলেন। সেই সব ক্ষেত্রে এই তুলনা আরো বেশি জরুরী।

(৬) সুশীলবাবু লিখেছেন, "রাধাকান্ত দেব···স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক নামে একটি বইও রচনা করেছেন।" (পৃঃ ১২৫)

কিন্তু এ বই-এর রচয়িতা রাধাকান্ত দেব নন, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রাধাকান্ত দেবের জীবনীর ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) 'স্বপ্নময়ী'-র সংলাপ অনেকটা পদ্য ছন্দে লেখা। নাটকে কবিতার ভাষা ব্যবহারের ফল কেমন হয়েছিল— এ-আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল।

(৮) গবেষণামূলক গ্রন্থে যে রেফারেন্স বইগুলির উল্লেখ থাকে, তাতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সুশীলবাবু পাদটীকার রেফারেন্স-গ্রন্থগুলির একটিতেও পাতার সংখ্যা বসান নি।

(৯) পরিশিষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে রচনাপঞ্জী দেওয়া হয়েছে তাতে জনপ্রিয় বসুমতী সংস্করণের গ্রন্থাবলীর (১-৫) নাম উল্লেখ করা হল না কেন বুঝলাম না। এই সংস্করণের ত্রুটি আছে, এবং সব বইও অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কতগুলি রচনা এতে স্থান পেয়েছে। ফলে সংস্করণটির গুরুত্ব আছে।

(১০) তত্ত্ববোধিনী, বালক, সাধনা, সাহিত্য, পুণ্য, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), সমালোচনী, ভাণ্ডার, মানসী ও মর্মবাণী, বঙ্গবাণী, মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত লেখার কতকগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই লেখাগুলির একটি তালিকা করা এবং সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ দরকার ছিল।

(১১) 'আত্মগঠন' অধ্যায়ে সুশীলবাবু লিখেছেন, "গীতার চর্চা সুরু হয়েছে।" এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য, এই সঙ্গে কেন যে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করলেন না বুঝলাম না। সত্যেন্দ্রনাথও গীতা-অনুরাগী ছিলেন, এবং ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন। ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে এর প্রথম সংস্করণ বেরোয়। দ্বিতীয় সংস্করণ কন্যা ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত সংশোধন করে গিয়েছিলেন।

(১২) নব রত্নমালা সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ। সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রিয়ম্বদা দেবী প্রকাশ করেন ১৯২৫-এ। এতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনা ছিল। এ বইটির উল্লেখ নেই রচনাপঞ্জীতে। এই সূত্রেই উল্লেখ করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্র-অনূদিত তুকারামের অভঙ্গের আলোচনাও বাদ পড়েছে।

(১৩) নবনাটক অভিনয়ের ন্যাশনাল পেপার কৃত সমালোচনা উদ্ধৃত করেছেন সুশীলবাবু। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট-এর সমালোচনা উল্লেখ করেন নি—খুব সম্ভবত সেখানে নটীবেশী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল বলে (···singing, we must confess, was not up to the mark)। আমার মনে হয়, এর উল্লেখ থাকলে কোনো ক্ষতি ছিল না। উনিশ বছর বয়সে একটি অভিনয়ে গান খারাপ গাইলেই (সমালোচকের মত যদি সত্য হয়) সঙ্গীত সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় না। বিশ্বভারতী পত্রিকা (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ) এবং জ্যোতিরিন্দ্র-অনুরাগী জীবনীকার মন্মথবাবুও এটি উল্লেখ করেছেন।

(১৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "সঙ্গীতে তাঁহার বিশিষ্ট দান—বাংলা গানে নূতন রীতিতে সুর-সংযোজনা। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে।"

রবীন্দ্রনাথও জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা

নিয়মের মধ্যে মন্দ গতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"

এই প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করিয়ে নতুন শক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু সুশীলবাবু সে-প্রত্যাশা পূরণ করেন নি।

(১৫) বীণাবাদিনী ও সঙ্গীতপ্রকাশিকা পত্রিকা দুটির গুরুত্ব অসামান্য। এ দুটি পত্রিকার পুরনো ফাইল মন্থন করে (যতটা সম্ভব) আলোচনা একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে আলোচনা দুঃখকরভাবে কম—ব্রজেন্দ্রনাথের একান্ত তথ্যধর্মী প্রবন্ধেও (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ২) এর চেয়ে বেশি আলোচনা আছে।

(১৬) নাট্য-আলোচনা অত্যন্ত দুর্বল। যেমন, পুরুবিক্রম সম্পর্কে সুশীলবাবু বলছেন : "যাই হোক, নাটকটি নাট্যরসে ভরা। আঘাত-প্রতিঘাত প্রেমপ্রীতি দেশদ্রোহিতা দেশানুরাগ চক্রান্ত—সবই এখানে বিদ্যমান।" নাট্যরসের এই-ই 'সব' কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

(১৭) 'পুনর্বসন্তে' শেকস্‌পিয়র-এর 'এ মিডসামার নাইটস ড্রীম'-এর ছায়াপাত ঘটেছে। শ্রীসুকুমার সেনও এ-কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯) কিন্তু সুশীলবাবু এ নিয়ে আলোচনা করেন নি।

(১৮) শেকসপিয়র্ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান প্রেরণা, নানা লেখক নানাভাবে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ পেয়েছেন। অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ প্রধান সাহিত্যরথীরা। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জুলিয়াস সিজার' অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক, এবং খুঁটিয়ে আলোচনা করলেও আমরা আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। কিন্তু সুশীলবাবু সেদিকে এক পা-ও অগ্রসর হন নি।

(১৯) রজতগিরিনন্দিনী-র একই বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনখানি নাটক আছে (হরচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ)। এদের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

(২০) 'অশ্রুমতী'-তে প্রতাপ-কন্যার সেলিম-প্রীতির জন্য নানা বিরুদ্ধ আন্দোলন হয়েছিল। আর সেই সঙ্গেই লক্ষণীয় যে অশ্রুমতী মঞ্চে সাফল্য ও

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই বৈপরীত্যের মীমাংসার একটা চেষ্টা কর… পারতেন সুশীলবাবু।

(২১) মঞ্চে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক কেমন সাড়া পেয়েছিল, তা তখনকার পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্র থেকে সংকলনের একটা চেষ্টা করতে পারতেন সুশীলবাবু। যেমন, সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী (এবং জ্যোতিরিন্দ্র-নাটকেরও নায়িকা) বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গে' 'আমার অভিনেত্রী জীবন' শীর্ষক স্মৃতিকথায় সরোজিনী-অভিনয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই রকম মন্তব্য সংগ্রহের দিকে একটা নজর দিলে ভালো হত।

(২২) সুশীলবাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কোনো আলোচনা করলেন না কেন বুঝলাম না।

(২৩) প্রায় দেড় হাজার ছবির উপর আলোচনা মাত্র পাচ পৃষ্ঠা। তাতেও রোটেনস্টাইন এবং অবনীন্দ্রনাথের পুরাতন লেখা দুটির উদ্ধৃতি প্রধান।

(২৪) পরিশিষ্টে অশ্রুমতী ও গীতা-অনুবাদ প্রসঙ্গে চিঠিপত্রগুলি অত বিশদভাবে সাজিয়ে দেওয়ার সার্থকতা কি। সবগুলি চিঠিই তথ্য হিসাবে পুরাতন—মন্মথবাবুর বইতে সংগৃহীত। পুরাতন তথ্য তো সাধারণত সংক্ষিপ্ত উল্লেখেরই দাবি রাখে।

(২৫) সুশীলবাবু লিখেছেন, "দেশের জমিদারেরাই যখন দেশ সম্বন্ধে উদাসীন তখন দেশের মাটিতে দেশানুরাগ দেখা দেওয়া সম্ভব নয়।" (পৃঃ ১৩…) মন্তব্য অনাবশ্যক।

(২৬) ডিরোজিয়ো সম্পর্কে সুশীলবাবু লিখেছেন, "হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর (ডিরোজিয়োর) এক শিষ্যদল। মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করে তাঁরা দেশের ধর্ম ও সংস্কারকে সেকালে আঘাত করেছিলেন। ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাঙনের নেশা হয়তো লাগিয়েছিলেন, চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে হয়তো গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রচিত এই কবিতা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতিও সঞ্চার করেছিলেন। এ দিক থেকেও ডিরোজিওর স্থান সামান্য নয়।" (পৃঃ ১৩৫) ডিরোজিয়ো সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল মূল্যায়ন।

(২৭) সুশীলবাবু লিখেছেন, "দেশপ্রাণতা জিনিষটা আজ কাল বা পরশুর জিনিষ নয়—এ চিরকালের মানুষের মনের একটা চিরকালীন বোধ।" (পৃঃ

১৬৮) সমাজতাত্ত্বিকেরা অবশ্য একে 'চিরকালীন' বলে স্বীকার করেন না। বরং বলেন, দেশপ্রাণতা জিনিষটা অনেকটা আধুনিক কালের।

(২৮) 'বঙ্গসাহিত্যে দান' অধ্যায়টি অত্যন্ত দুর্বল।

(২৯) ডিরোজিও-র নাম 'হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও' নয়। (পৃঃ ১২৫) হেনরীর পরে 'লুই' শব্দটি আছে।

(৩০) ডিরোজিয়ো এবং তাঁর ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের নাম 'অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশন' নয় (পৃঃ ১২৫), অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।

(৩১) সুশীলবাবু লিখেছেন, "এই মানুষটির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) বিষয় চিন্তা করলেই আমাদের মনে হয় রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের কথা।" (পৃঃ ১৯৩) কি জানি, আমার তো মনে হয় না। বরং ওটা চিন্তা করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছায়া আমার মনে যেমন আছে, তা অত্যন্ত বিকৃত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

(৩২) বইটির ভাষা মাঝে মাঝে হালের রম্যরচনা-ধর্মী হয়ে বিষয় অনুপাতে লঘু হয়ে পড়েছে। সুশীলবাবু কবি, শব্দ-ব্যবহারে তাঁর মনোযোগ বেশি দেওয়ার কথা। কিন্তু তা বোধহয় তিনি দেন নি। নিছক গবেষক হলে তাঁকে এ কথা বলার দরকার হত না। কিন্তু সুশীলবাবুর বড় পরিচয় শিল্পী হিসেবে। তাই কথাটা এসে পড়ল।

পরের সংস্করণে এই সব দিকে একটু দৃষ্টি দিলে সুশীলবাবু আমাদের কাছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উজ্জ্বলতর রূপ উদ্‌ঘাটিত করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

দেবেশ রায়

"অশ্বমেধের ঘোড়া" : দীপেন্দ্রনাথ

বাংলাদেশের আবহাওয়া এখন ব্যবসায়ী স্বদেশপ্রেমে মাতাল। সাহিত্যস্রষ্টা এখন সাহিত্যিক নন, খবরের কাগজের মালিক। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র, অর্থবান প্রকাশক প্রতিষ্ঠান, সরকারী বদান্যতা-পু… স্কুল-কলেজের ও আধা সরকারী গ্রন্থাগার—এই তিনের পাপচক্রে সৃষ্টিহীন সাহিত্য এখন আকাশকুসুম, এই তিনের অনুগ্রহ-বঞ্চিত জীবন্ত সাহিত্যিক এখন এদেশে খুঁজে পেতে হলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দক্ষতাও যথেষ্ট নয়।

যে-সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক এদেশের সাহিত্যের একচেটিয়া ইজারাদার, তার কোনোটিতেই কোনোদিন স্বনামে ও বেনামে দীপেন্দ্রনাথের কোনো গ… প্রকাশিত হয় নি। যে-সকল পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, সেগুলো আকারে শীর্ণ, প্রচারে সীমিত, ও ছাপাই-বাঁধাইয়ে দরিদ্র। সে-সকল পত্রিকার একমা… গুণ : বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে তাঁরা বিশ্বভাবনা… সঙ্গে যুক্ত করতে চান। 'পরিচয়' 'নতুন সাহিত্য'—এই দুটিই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাংলা-সাহিত্যের একজ… লেখক অনেকেই এ-বিষয়ে অবহিত নন।

যাঁর দখলে দৈনিক পত্রিকার প্রচার নেই, সেই পত্রিকার তৈরি বাজা… নেই, এমনকি পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে সমালোচিত হবারও নিশ্চয়তা নেই— তেমন একজন লেখকের—এই অসময়ে, যখন খবরের কাগজের কলম … সাপ্তাহিকে পাতা অনুযায়ী নগদমূল্যে ব্যবসায়ী স্বদেশপ্রেম প্রচারই পরম… থেকে হাঙ্গরি জেনারেশন পর্যন্ত সকল 'সাহিত্যিকের' ব্রত—একটি মৌলি… গল্পগ্রন্থ বের করার হিম্মত এক মহাদুঃসাহসী শিল্পীরই থাকতে পারে। 'শিল্পী… স্বাধীনতা'র উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতির পাতায় শিল্পী নেই, স্বাধীনতা নেই। শিল্পী… তাঁর স্বাধীনতা নিয়ে আছেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'য়। শিল্পী যা বিশ্বাস করেন …

অশ্বমেধের ঘোড়া। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৃজনী কলকাতা। ২'৫০ ন. প.।

যা লিখবেন তার ওপর কারো হুকুম চলবে না, তা সে যত বড় কর্তাই হোক না কেন? আর সে বিশ্বাস যদি মানবতায় বিশ্বাসের মাটি থেকে রস নিয়ে বেঁচে থাকে, তবে দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই তাকে পরাস্ত করে।

এ কথাগুলো দীপেন্দ্রনাথের মনে ছিল বলেই কি তিনি এই বইয়ের নাম দিয়েছেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। এই সৃষ্টিশীলতাকে রুখবার দম্ভ করতে কে সাহস করে?

গ্রন্থটির মধ্যে পাঁচটি গল্প আছে। পাঁচটি গল্পেই দীপেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা ধরা পড়ে।

১। মধ্যবিত্তেতর শ্রেণীকে নিয়ে ১৯৩০-এর পর তের-চোদ্দ বৎসর বাংলা-সাহিত্যে অসাধারণ গল্প রচিত হয়েছে। এই সময়কার বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ—বিষয়ের প্রসার। স্বাধীনতা লাভের পর, দিনে দিনে আমাদের সাহিত্য থেকে নিম্নশ্রেণী নির্বাসিত হয়েছে ও হচ্ছে। যাঁরা তাঁদের নিয়ে লিখেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। দীপেন্দ্রনাথের এই বইটিতে অন্তত একটি গল্পের (জটায়ু) চরিত্রগুলি নিম্নশ্রেণীর। আর একটি গল্পের চরিত্র অর্থগতভাবে প্রায় পুরোপুরিই নিম্নশ্রেণীর, মনোগতভাবে অর্ধ-মধ্যবিত্ত—'মৃত শহর। বসন্ত'। আরো একটি গল্প নিম্নশ্রেণীর দিকে গতিসম্পন্ন মধ্যশ্রেণীর শ্রেণীচ্যুতি নিয়ে রচিত—'প্রহরা'। বাকি দুটি গল্পের চরিত্র মধ্যবিত্ত যুবক। সুতরাং বিষয়ের দিক থেকে দীপেন্দ্রনাথ নিজের শ্রেণীসীমাই শুধু উত্তীর্ণ হন নি, ১৯৩০-৪৫-এর বাংলা গল্পের একটা ঐতিহাসিক উপার্জনকে বহন করছেন।

২। তাই বলে তাঁর এই গল্পগুলি শুধুমাত্র শ্রেণীগত বা অন্তশ্রেণী চরিত্র নিয়েই নয়। তা যদি হতো, তাহলে ৩০-৪৫ এর গল্পগুলির অনুকরণ হত। বা এই গল্পগুলি শ্রেণীগত চারিত্র্যকে ফোটাবার জন্য একটি 'ক্রমশ প্রকাশ্য' ঘটনার নাটকীয় কাহিনীর আশ্রয়েও রচিত হয় নি। তা যদি হত, তাহলে ৩০-৪৫-এর গল্পের অনুকারকদের অনুকরণ হত। বাংলা গল্পের ঐ ঐতিহ্যকে দীপেন্দ্রনাথ নতুন সম্পদ দিয়েছেন।

'জটায়ু' গল্পটিকেই বিশ্লেষণ করলে দীপেন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুটি গুণ বলতে কী বোঝানো যদি পরিষ্কার হবে।

নেত্যচরণ স্বাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা ইত্যাদির পাকে-পড়া নিম্নশ্রেণীর একটি যুবক। দুর্গাও তদনুরূপ একটি যুবতী। উভয়ের বিয়ে হয়েছে। ট্রেনে ট্রেনে

স্বপুরি চোরাই চালানের সময় একবার নেত্যচরণের হাত কাটা যায়। দুর্গা তাকে খাওয়ায়। হাত কাটা যাবার পরও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সে বৎসরও কালীপুজোয় নেত্যচরণ নাচতে আসে। সেই নাচার ঘটনাটি গল্পের ঘটনা। যে ব্যাটাছেলেকে স্বপুরির চোরাই চালান করতে হয় সে আর্থিকভাবে নিশ্চয়ই নিম্নশ্রেণীর। যে মেয়েকে রেস্টুরেণ্টে কাজ করে সংসার চালাতে হয় সেও আর্থিকভাবে নিশ্চয়ই নিম্নশ্রেণীর। অথচ দীপেন্দ্রনাথ নেত্যচরণ ও দুর্গার দৈনন্দিন জীবনের কথা বা তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বহু তথ্যের পরিচয় দেয়—এমন পথ এড়ালেন কেন? এই কারণে যে, তিনি শুধু একটি নিম্নশ্রেণীর জীবন জানানোর জন্য ছোট গল্প লিখতে বসেন নি। যে-জীবনসংগ্রামের অংশ ঐ নিম্নশ্রেণীর-ও জীবনসংগ্রাম, দীপেন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট তাই। সে-কারণে গল্পটিতে নেত্যচরণের নাচের এক একটা বিশেষ পর্বের অনুষঙ্গে দুর্গার জীবনে এক একটা বিশেষ পর্ব আসছে। নেত্যচরণ নাচ শুরু করেছে—দুর্গার মনে এসেছে দেশের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার, তার বাবাকে মেরে ফেলার ঘটনা। নেত্যচরণের নাচের দ্বিতীয় পর্বে দুর্গার মনে এসেছে নেত্যচরণের টুঁটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা। নেত্যচরণের নাচের তৃতীয় পর্বে দুর্গার মনে এসেছে রেস্টুরেণ্টের কেবিনে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা।

এই যে নেত্যচরণের একটা, দুটো, তিনটে আগুনের বেড়ার মধ্যে ঘেরা-পড়া আর নাচার অনুষঙ্গে দুর্গার একটা, দুটো, তিনটে ঘটনার স্মৃতি—এই দুটি জড়িয়ে যাওয়া মাত্রই নেত্যচরণের নাচটা আর একটা ঘটনামাত্র থাকে না, হয়ে যায় প্রতীক। এবং তখন দুর্গা ও নেত্যচরণের জন্য কোনো আলাদা বাক্যও ব্যবহার করেন না লেখক: "নাচতে নাচতে নিত্যচরণ ... দুর্বোধ্য বিস্ময়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। অজ্ঞাতে তার পা দ্রুত ... উঠেছে।...দুর্গা স্তম্ভিত হয়ে দেখল নেত্যচরণের মাথা থেকে মালসাটা ... গেল, যেন পরমবিরক্তিতে সে বাহুল্য ঝাঁড়িয়ে ফেলে দেবে।... আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা যায়, বুঝি হাত বাড়ালেই দুর্গা ছুঁতে পারে ... কালো কালো পাথরকুচি, ক্ষয়া কাঠের তক্তা, চকচকে লাইন। ... চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। নাট-বল্টুগুলো ঝনঝন করে বাজছে।...থরথর ... লাইন দুটো কাঁপছিল। থরথর করে খোয়াইগুলো কাঁপছিল। গাড়ির ... নাট, বল্টু ঝনঝন ঝনঝন করে বাজছিল।" দুর্গা ও নেত্যচরণের অভিন্নতা ... তফাৎ বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। আবার যখন ...

হিসেবে ব্যবহার না করে ঘটনাটাকে বস্তুত ঘটনা হিসেবেই তিনি উপস্থিত করতে চান, তখনো তিনি অতি-স্পষ্ট: "নেত্য আজ সেজেছে। সাবান ঘষে ঘষে মাথার চুল ফাঁপিয়েছে। কপালে সিঁদুর দিয়ে ফোঁটা কেটেছে। গলায়, বাহুতে টকটকে পাকা জামের তুল্য ডবকা পুঁতির মালা।" ইত্যাদি। ৩০-৪৫-এর 'নিম্ন শ্রেণীর গল্পের' ওপর এই হচ্ছে দীপেন্দ্রনাথের যোগ। শ্রেণীগত বিষয়কে শ্রেণীর ওপরে জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা।

অথচ এর কোনোটিই আঙ্গিক নিয়মে হচ্ছে না। দীপেন্দ্রনাথ মানুষকে, ঘটনার ভেতরের মানুষকে ধরতে চান। 'জটায়ু'তে এই ভেতরের দুর্গাকেই সবচেয়ে আগে পাঠকের সামনে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। সে দুর্গা ভয় পায়। ভয়ের একটা অতি-উত্তেজনার মধ্যে দুর্গা আছে। কেন ভয়? এমনি সব আজেবাজে কারণে—"সেই ভয়টা, সেই ভয়টা। আবার। এখন। বুক ঢিবঢিব করছে।...ছুটির পর ফেরার পথে লোকটাকে স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে দেখেছিল। তার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা কুঁচকোল, হাসল।" কিংবা, "...নামবার সময় হঠাৎ দেখলো একটা যোয়ান ছেলে রেলিং ঘেষে দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়ি ধরাতে ভুলে গেল। এই লোকটাই কি?" কেন এত অকারণ ভয়? "বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সব সময় কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে বুঝতে পারি।" এই সূত্রে তারপর ধীরে নেত্যর নাচ ও দুর্গার জীবন। এই পদ্ধতিটাকে মনে রেখে গল্পটিকে অনুসরণ না করলে গল্পের শেষে এসে তালগোল পাকিয়ে যাবে। কেননা, সেখানে আগুনের বেড়ার ভেতরে নৃত্যরত নেত্যচরণই দুর্গার নিয়তি হয়ে গেছে। এ-সিদ্ধান্তে একমাত্র তখনই আসা সম্ভব যখন নেত্যচরণের আগুন আর দুর্গার জীবন এক বলে প্রমাণিত। এই আগুনের আলোতেই স্পষ্ট হয় রাবণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বিহঙ্গটি এই গল্পের শিরোনামে কেন? রামায়ণের সেই পক্ষী, আর নেত্য আর দুর্গা একই সংগ্রামের সঙ্গী।

'জটায়ু'-তে আমরা দেখি লেখক একটির পর একটি ঘটনা ত্যাগ করে শুধু চরিত্র আর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চিত্রের যোগসূত্র কী ভাবে রচেছেন। ঠিক এর উল্টো ব্যাপারটা 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-য়। এ-গল্পটি একটি ঘটনা-ভিত্তিক: গোপনে-বিবাহিত স্বামীস্ত্রীর বিবাহ-বার্ষিকী উদযাপন। অনেকে মনে করেন ঘটনা-সৃষ্টির অক্ষমতাই লেখকদের ঘটনাবিমুখ করে। তাঁদের উচিত 'জটায়ু'র পরেই "অশ্বমেধের ঘোড়া" পড়া এবং বিশেষ করে ফিটনে

ওঠা থেকে গল্পের শেষাংশ পর্যন্ত কাঞ্চন-রেখার কথোপকথন ও ব্যবহারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা। তাহলেই দেখা যাবে সিচুয়েশন তৈরির কি অনায়াস-দক্ষতা দীপেন্দ্রনাথের কলমে: "…বন্ধ গাড়ি চলছে, বাইরে বৃষ্টি, আজ আমাদের বিবাহের প্রথম বার্ষিকী। আমার স্ত্রী রেখা—"…

"হাতের তেলোর ওপর মাথা রেখে ঘাড়টা পেছন দিকে ঈষৎ ঝুলিয়ে জানুর ওপর আড়াআড়ি করে পা ফেলে রেখা শিথিল ভঙ্গিতে বসেছিল। একগোছা ভেজাচুল টিকলির মতো কুঁকড়ে ঝুলে আছে। গর্বে, আনন্দে, রেখা যেন রাজেন্দ্রাণী।

প্রায়ই আজকাল রেখাটা অপরিচিত মনে হয়।"…

'আঁচল সরে গিয়েছিল। একটা সেফটিপিন। কাঞ্চনের খুব ইচ্ছে হলো বলে, জামায় বোতাম লাগিয়ে নিতে পারো না? বলল 'কি দেখছ এমন করে?'

রেখা হাসল। বলল, 'জানো, আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম তোমার গলায় একটা তিল আছে।'

'এই অন্ধকারে?'

'হুঁ। যখন সিগারেট ধরালে, হঠাৎ তোমার'—"

এই এক একটা বাক্যের ধাক্কায় এমন একটি সিচুয়েশন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে যেখানে গল্পের শেষে এই দুজন স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে টাঙাওয়ালা বেশি পয়সা দাবি করে। দীপেন্দ্রনাথের সংলাপ রচনার শক্তি অসাধারণ। 'অশ্বমেধের ঘোড়া'তেই তার সবচেয়ে সুন্দর প্রমাণ আছে। সংলাপ-ই, এমনকি, এতোটা সিচুয়েশন গড়ে দিচ্ছে।

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটি সম্পর্কে আমার একটি আপত্তি: রেখা ও কাঞ্চন বিয়ে করেও কেন প্রকাশ করতে পারছে না সে কারণটি স্পষ্ট নয়। লেখক দু-একবার আভাসে রেখার ভয়, পরিবার ইত্যাদির কথা বলেছেন বটে কিন্তু মনে হয় যে এই কারণটিকে আরো স্পষ্টভাবে আনলে গল্পটির গঠন অনেক বেশি দৃঢ় হত।

গল্পের গঠনের দৃঢ়তার প্রতি দীপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। তবে কোনো গল্পেই গল্পের মূলসূত্রের সঙ্গে যোগসূত্রহীন কোনো অংশ কিছুতেই পাওয়া যাবে না—তা সে অংশ আপাতদৃষ্টিতে যত বিচ্ছিন্নই হোক না কেন? 'মৃত শহর। বসন্ত' গল্পটির প্রথম ও উপান্ত অনুচ্ছেদ সহ ভেতরকার অনেক অংশই দুর্বোধ্য মনে হয়। প্রথম অনুচ্ছেদেই শহরের মৃত্যুর বর্ণনা

দিচ্ছেন এইভাবে: "অনেকদিন ধরে ধুঁকছিল। তারপর মরে গেল। প্রথমে ঢাকনা উঠল। ধোঁয়া। পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া। পাতলা লোমের মতো সরু রেখা কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা, এবং তাতে সাপের দাঁত ছিল, যেন একটা বাঘের থাবা। আর দানবটা বেরুল। মুখ খিঁচিয়ে হাসল। বিচিত্র শব্দ করে হাসল।" ইত্যাদি। এই সাপ, বাঘ, দাঁত, কবরখানা ইত্যাদি দেখে-শুনে পাঠকের পক্ষে ভীত ও আতঙ্কিত হওয়া কিছুই বিস্ময়কর নয়। কিন্তু এরূপ একটি মৃত্যু আর কোনো এক অনির্দিষ্ট দানবের বের হওয়া আর শেয়ালগুলোর নিঃশব্দে শহরে ছড়িয়ে পড়ার বর্ণনার পরই পাঠক যদি চরণবাবুর বাড়িতে এসে দেখেন সেখানে আলো নেই, কুমারী বিলু পাগলিনী, এক বৃদ্ধ অন্ধ পরাজিত আঁকিয়ে চরণবাবু স্থবিরের মতো বসে থেকেও একটি পরস্ত্রীকে ভালোবাসেন, দূর থেকে ভালোবাসেন,—তাহলেও কি তিনি হদিশ করতে পারবেন না প্রথম অনুচ্ছেদের কবরখানার ঐ ধোঁয়াটে শেয়ালগুলো কোথায় আছে, মৃত্যুর আজ্ঞাবহ সেই ধোঁয়াটে দানবটা কি কি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। উপান্ত অনুচ্ছেদে লেখককে তাই সেই শহরের বসন্তের বন্যার কথা আবার বলে নিতে হয়:

"কবরখানাটা সমুদ্র হয়ে গেল। সমুদ্রমন্থন করে উঠল নীরবতার সুর। দেশবন্ধু স্কোয়ার থেকে দেশপ্রিয় পার্ক এক লক্ষ সেতার একটি শোক হয়ে হেঁটে গেল। তারপর শোক ফুল হয়ে ফুটল।"

নইলে চরণবাবুর বাড়ির বসন্তের বর্ণনায় গল্পটা শেষ হতে পারত না: "আমার মনে হলো, ফিউজ না সারলে বিলুর কপালে চুলের যে-লতিটা কি একটা ফুলের মতো কুঁকড়ে আছে, তা-ই হয়তো চোখে পড়ত না।"

পাঠককে যদি এটুকু বিব্রতও না করতে হত নিঃসন্দেহে লেখক খুশি হতেন। কিন্তু এটা একটা সর্বজনীন দুর্ভাগ্য যে আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়েই সদা বিব্রত, লেখক আমাদের নিয়ে বিব্রত না হয়ে করেন কি? দীপেন্দ্রনাথের এই পাঁচটি গল্পের ভেতরকার যোগসূত্রই এই: তিনি আত্মপরিচয়লুপ্ত মানুষগুলির সঙ্গে আত্মপরিচয় সন্ধান করছেন। আত্মপরিচয়-সন্ধানী মানুষ দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্যের অন্বিষ্ট। এই অন্বেষণ বুদ্ধির পথ দিয়ে করা যায়। সে পথ বোধ করি কিছু সহজগম্য। দীপেন্দ্রনাথ নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকের আচরণে এই যন্ত্রণার ব্যাখ্যা করার চাইতে, এই যন্ত্রণাবিদ্ধ চরিত্রগুলির সঙ্গে তাদের আত্মার অনুসন্ধানে রত হতে ভালোবাসেন।

সুবোধ ঘোষ যখন সাহিত্যিক ছিলেন, 'গোত্রান্তর' নামে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই পর্বে রচিত তাঁর আর একটি গল্পের বিষয়ও ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে পতিত একজন সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, ও তার সঙ্গিনীর মিলিত শ্রেণীচ্যুতি। এই কারণেই এ-গল্পদুটি বাংলাসাহিত্যের গর্ব, যে, সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ সাহিত্যে এসেছে, এবং এসেছে জীবনের তাপ হিসেবে। দীপেন্দ্রনাথের 'প্রহরা' গল্পটির বিষয়ও এরূপ শ্রেণীপতন। গোত্রান্তরের নায়ক তার মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায়। এই স্খলন তার শ্রেণীর অন্তরের দুর্বলতা। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? এই স্খলনের পর ব্যক্তিমানুষটির বিবেক, ব্যক্তিত্ব ও পাপবোধকে শান্ত করতে পারে কোন শ্রেণীবোধ। 'প্রহরা' গল্পটি এমন একজন মধ্যবিত্ত যুবকের কথা যে পারিবারিক দায় পালন করার জন্য অফিসের তহবিল তছরুপ করেছিল, সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বড়বাবুর ছেলে সেজে পরীক্ষা দিয়েছে—এবং এখন খুঁজে পাচ্ছে না সে কে, তার আত্মপরিচয় কি, সে বিমল না অমিয়? যে-চরিত্র নিজের নামটা পর্যন্ত জানে না, তার কথা লিখতে গেলে, এবং বুদ্ধিগত বিশ্লেষণে শেষ না করে সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মপরিচয়লুপ্ত যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ফিরে যদি তার কথা লিখতে হয়—তবে লেখকের ঘাড়ে দায়িত্ব অর্শায় যে যে-করেই হোক এই যুবকটিকে এমন একটা জায়গার হদিশ দাও যেখানে সে তার আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার মন্ত্র জানতে পারবে। সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' শেষ হয় গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই। দীপেন্দ্রনাথের গল্প শুরু হয় তার পর থেকে। গোত্রান্তরের পর সেই আহত আত্মাটিকে তিনি খোঁজেন।

নইলে 'স্বয়ংবর সভা'-র তিনবন্ধুর আড্ডাবাজিতেই অমন একটি সুন্দর গল্প গড়ে উঠত না। তিনবন্ধু মিলে গল্প করছে—কে কত খারাপ কাজ করেছে, কে কত আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছে, ইত্যাদি। তিনটি চরিত্রের একটি ঈশ্বরবিশ্বাসী, একটি ঘোর অবিশ্বাসী, একটি আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু তিনজনই সময় নামক ব্যাধের বাণবিদ্ধ তিন হংস—নিজের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পড়েছে ক্রমাগত। তাই শেষ পর্যন্ত মেয়ে নিয়ে জুয়োখেলা। দেখা মেয়ে, শোনা মেয়ে, পথের মেয়ে, বেশ্যা, ফিল্ম স্টার—শেষ পর্যন্ত 'স্রেফ নামের ওপরে হোক কানে শোনা, বইয়ে পড়া।'

অখিল হঠাৎ উঠে বসে সাজেস্ট করলো 'দ্রৌপদী।'···

সুধাংশু বললো 'ভালো করে সাফ্‌ল করো।'

বিনয় ফিসফিস করে বললো 'কাটো।'

তিনভাগে তাস পড়লো। ওরা দুজন নিজের তাস তুলে নিল। বাকি তিনটে তাসের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু ভাবল—সময়; বিনয় ভাবল, নিয়তি; অখিল ভাবল, আমি। তারপর দ্রৌপদীর জন্য শেষ বাজি আরম্ভ হলো।"

এই যে সময়-নিয়তি আর মানুষ জীবনকে জিতে নেবার জন্য লড়ছে, এই লড়াইয়ের মাঝখানে চরিত্রকে না-আনা পর্যন্ত দীপেন্দ্রনাথের ক্ষান্তি নেই। তাঁর প্রতিটি গল্পের শুরু আত্মপরিচয়লুপ্ত কতকগুলি কেন্দ্রহীন আপাত-বিশৃঙ্খল চরিত্র নিয়ে বা সিচুয়েশন নিয়ে, আর প্রতিটি গল্পের শেষ সেই লড়াইয়ের—যে লড়াই জিতে নিতে পারলে চরিত্র তার আত্মাটিকে ফিরে পাবে। এই মহৎ সংগ্রামের মধ্যে চরিত্রকে নিয়ে আসাই দীপেন্দ্রনাথের কমিটমেন্ট। নইলে অনেকেই মজাদার ও রংদার শারীরিক গল্প লিখে থাকেন। তাঁদের গল্প মজা আর রঙেই শেষ। শেষে এসে একটা কমিটমেন্ট উচ্চারণ করে না, যা শপথের মতো শোনাবে।

'চর্যাপদের হরিণী' ও 'অশ্বমেধের ঘোড়া' আবার পড়বার পর শুধু বলতে পারি—দীপেন্দ্রনাথ লিখুন, লিখুন। আমরা পড়ি, পড়ি।

আজকের বাংলাদেশে সৎ-রচনার জন্য প্রার্থনার চাইতে বড় প্রার্থনা আর কি হতে পারে।

বইটির প্রকাশনা ব্যাপারে প্রকাশক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না। ছাপা-বাঁধাই খারাপ। মুদ্রণ-ত্রুটি প্রচুর।

গৌতম সান্যাল

শিল্প স্বাধীনতা ও সমাজ

কোনো ভাবাদর্শ অথবা মতবাদের যাথার্থ্য কেবল নিছক তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণিত হয় না। ভাবাদর্শের প্রমাণের জন্য যে-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং তাত্ত্বিক যাথার্থ্যের যে-লক্ষণ করা হয় সেগুলিই উক্ত ভাবাদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। তবুও যখন কতগুলি প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা কোনো এক বিশেষ ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় নিষ্ঠা, সততা এবং শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তখন তা অভিনন্দনযোগ্য। এবং একথা শান্তি বসুর 'শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ' গ্রন্থ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

শিল্প, স্বাধীনতা ও সমাজ—এই তিনটি বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনাই এই গ্রন্থের মূল বিষয়। প্রসঙ্গত লেখক 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'-এর দেশের আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্যের আলোচনা করেছেন, এবং উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজনের (মূলত শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআবু সৈয়দ আইয়ুব এবং শ্রীঅম্লান দত্ত) ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। লেখকের মতে এঁরা সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন এবং রাজনীতির পাঁকে নেমেছেন। পরন্তু এঁদের রাজনীতি নিছক ব্যক্তিগত রাগ বিদ্বেষ জ্বালা দিয়ে তৈরি। কাজেই এঁদের আচরণ পরনিন্দার হীন গর্হিত আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। "তারাশঙ্কর ও শ্রীআইয়ুবদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হীন অপপ্রচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে" লেখক চীন-সংস্কৃতির মহত্ব বিষয়ে বিস্তারিত প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য "রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর শিক্ষায় যেহেতু আমরা শিখেছি পর-সংস্কৃতির প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা থেকেই আত্মজ্ঞানের ও মর্যাদাবোধের জন্ম, চূড়ান্ত নোংরামি ও মনুষ্যত্বের অবমাননাতেও ভারতবর্ষ নিজের আত্মিক ঐশ্বর্য, সম্ভ্রম ও জীবনের শীল নষ্ট করবে না। প্রতিটি দেশ ও জাতির প্রাপ্য মিটিয়েই নিজের সিদ্ধিতে আত্মস্থ হবে। বর্তমানের দুর্দিন কখনই আগামীর সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে পারবে না।

কারণ আমরা জেনেছি ভারতবর্ষের 'মহৎ প্রহরী' বারবার ঘোষণা করেছেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' চীনের দুর্বিনীত সরকার ভারতের হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে কিন্তু সেই অপরাধের দায়িত্ব সমগ্র জনসাধারণের ও তাদের সংস্কৃতির নয়।" (পৃঃ ৪০) "আসলে শ্রীআইয়ুবরা স্বার্থের তাড়ায় ভুলতে চান যে··· আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সুগভীর চারিত্র্যেই সাম্যবাদীরা ইতিহাসে স্থান পেতে যাচ্ছে।" (পৃঃ ৩০)

গণতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের বক্তব্য সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য হল সাম্যবাদের মতো গণতন্ত্রও আরেকটি ভুল তত্ত্ব। কাজেই সমাজ, স্বাধীনতা ও শিল্প বিষয়ে গণতান্ত্রিকদের বক্তব্য ও সাম্যবাদীদের বক্তব্যের ন্যায় বর্জনীয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্যটি লেখক ভূমিকাতেই প্রকাশ করেছেন। "শ্রীআইয়ুবরা যতই সাম্যবাদবিরোধী হন-না কেন, আসলে সাম্যবাদ ও ওঁদের বক্তব্যে কোনো ফারাক নেই। গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ ভালোমন্দ নিয়ে একই বৃক্ষের দুটি শাখামাত্র। আর বৃক্ষটি হলো ইওরোপীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারা।" (ভূমিকা, পৃষ্ঠা এক) তাঁর মতে এই দুই ভাবাদর্শই অপূর্ণ এবং ভ্রান্ত। "একমাত্র ভারতবর্ষের মহৎ সাধনা ও সিদ্ধিতেই আছে তমসা থেকে জ্যোতিতে উত্তরণের পথ।" এই ধারণার অনুবর্তী হয়ে লেখক জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ তিনটি প্রত্যয়—সমাজ, স্বাধীনতা ও শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দুঃখের বিষয় যতখানি গভীর আবেগে লেখক আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর কার্যে ব্রতী হয়েছেন ঠিক সেই পরিমাণে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট ও যুক্তিসিদ্ধ করে তুলতে পারেন নি।

দুই

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক 'সমাজ' প্রত্যয়ের আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর সমাজ-সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করে সেগুলির মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। এগুলি হল (১) মার্কসীয় মতবাদ (২) গণতান্ত্রিক মতবাদ (৩) হেগেলীয় মতবাদ ও (৪) ভারতীয় মতবাদ। সমাজ-সম্পর্কিত আলোচনাটি যথেষ্ট তথ্যবহুল এবং সেই হিসাবে মূল্যবানও; কিন্তু কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুর্বল পদ্ধতিতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এরকম কতগুলি অংশের আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন আছে।

মার্কসবাদ-প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন এলোমেলো উদ্ধৃতির সাহায্যে হরেক রকম প্রমাণ করা যায়। এবং তিনি নিজেই এই দোষে দুষ্ট করেছেন তাঁর বক্তব্যকে ; পরন্তু তিনি যে সমস্ত উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করে না। লেখকের মতে : মার্কসবাদ অনুসারে মানুষ উৎপাদন-শক্তির দাস। অতএব, একটা যন্ত্রের অংশ মাত্র এবং এই বক্তব্যের দ্বারা মার্কস মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিলেন। উৎপাদন-শক্তির দাস বলতে লেখক কি বুঝেছেন জানি না—কিন্তু 'উৎপাদন-শক্তি' কথার অর্থ তিনি যদি মার্কসবাদে অন্বেষণ করতেন তাহলে দেখতে পেতেন উৎপাদন-শক্তি বলতে মার্কস যা বোঝাতে চেয়েছেন তাতে উৎপাদন-শক্তির অন্যতম অংশ হল মানুষ নিজেই। উৎপাদন-শক্তির প্রকৃত রূপ নির্ধারিত হয় মানুষের দৈহিক শক্তি, তার কর্মকুশলতা, তার শিক্ষা—এমনকি তার মানসিকতার দ্বারা। কাজেই মানুষ উৎপাদন-শক্তির দাস এই আশ্রয়স্থল থেকে লেখক যখন সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষ যন্ত্রের অংশমাত্র এবং মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকার করল—তখন এই কথাই বলতে হয় যে আশ্রয়স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে নয় তিনি অজ্ঞ অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই প্রকৃত তাৎপর্যকে তিনি বিকৃত করেছেন। দ্বিতীয়ত, লেখকের মতে মার্কস সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলিকে স্বীকার করলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা স্বীকার করেন নি। এ-ধরনের মন্তব্যও মার্কসবাদ সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক। মার্কস সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা কোনো সময়েই অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির রূপ এবং ক্রিয়াকলাপ মূলত উৎপাদন-কাঠামো ও তন্নিষ্ঠ বিভিন্ন সামাজিক ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব সামাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে" মার্কস-এর এ বক্তব্যটিও লেখক অজ্ঞতার জন্য অথবা বিকৃত করার ইচ্ছায় ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের মতে এর অর্থ হল সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপ জড়বস্তুর আচরণ অথবা মানবেতর অন্যান্য প্রাণীদের মতো নিছক যান্ত্রিক। প্রথমত বলা যেতে পারে যে "সামাজিক অস্তিত্ব" বলতে মার্কস সমাজের বিশেষ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাঠামোকে (যার ভেতরে ব্যক্তির মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মকুশলতা মিশে আছে) বুঝিয়েছেন এবং সামাজিক চৈতন্য বলতে তিনি সমাজাশ্রয়ী বিভিন্ন ভাবাদর্শকে বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, মার্কস একথাও অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে মূলত "সামাজিক

অস্তিত্ব" "সামাজিক চৈতন্য"কে নিয়ন্ত্রিত করলেও "সামাজিক চৈতন্য"ও "সামাজিক অস্তিত্ব"কে আচ্ছন্ন করে। তা যদি না হত তো মার্কস নিজেই "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ" স্বরূপ ভাবাদর্শের (যা "সামাজিক চৈতন্যের" অংশ স্বরূপ) কথা বলতেন না। সমাজের যে কোনো পর্যায়ে বিপ্লবের কথা এবং বিপ্লবোত্তর "সামাজিক অস্তিত্বে"র পরিবর্তনের কথাও নিতান্ত অর্থহীন হয়। বস্তু ও চৈতন্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলিও নিতান্ত তাঁর আত্মকেন্দ্রিক (solipsistic) ধারণা।

গণতন্ত্র সম্পর্কে শ্রীবসুর আলোচনার দুটি দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তাঁর মতে "পশ্চিমী গণতান্ত্রিক বক্তব্যের মূল কথাই হল সমাজ একটা চুক্তি।" শ্রীবসুর মতে যেহেতু গণতন্ত্র সমাজকে একটা চুক্তি বলে মনে করে—গণতন্ত্র সমাজকে হেয় জ্ঞান করে। 'সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'চুক্তি' শব্দটি আমরা যদি ব্যাপক এবং গভীর অর্থে দেখি তাহলে অন্তত 'সমাজ একটি চুক্তি' কেবল এই কারণেই সমাজবন্ধ সুদৃঢ় নয়—এরকম ভাববার কোনো কারণ থাকে না। গণতন্ত্র একটি আদর্শ অবস্থার চিত্র। কিন্তু কেমন করে এই অবস্থায় উপনীত হব—এ-সম্বন্ধে এ তত্ত্ব তেমন পরিস্কার নয়।

রাসেল সম্পর্কে শ্রীবসু মন্তব্য করেছেন : 'রাসেল, লক-হিউমের ঐতিহ্যে জারিত থাকায়, একবারও ভাবতে নারাজ যে শুধুমাত্র বর্তমান তথ্যের নজীরে সমগ্র সমাজের ক্রম ছকা যায় না,…।' যতদূর বুঝি রাসেল সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য যথার্থ নয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই তা অনেকখানি স্পষ্ট হয়।

"History has perhaps its greatest value in enlarging the world of our imagination, making us, in thought and feeling, citizens of a larger universe than that of our daily preoccupations," (Russell's 'Reply to Criticisms in The Philosophy of Bertrand Russell', edited by Paul Aurthur Schilpp)

অথবা, আরও পরিষ্কার ভাবে খুঁজতে গেলে :

"There are certain social phenomena more especially those that are economic or statistical, where to a limited extent scientific laws can be discovered. But the limitations are always important." (Ibid)

মার্কসীয় ও গণতান্ত্রিক সমাজতত্ত্বের পর লেখক আলোচনা করেছেন হেগেলীয় ও 'ভারতীয়' সমাজতত্ত্বের আলোচনায়। হেগেলের বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তা অত্যন্ত অপরিস্ফুট থেকে গেছে। মার্কস-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন হেগেলের সমস্ত আলোচনাটাই ন্যায় কালের পরিমাপ নয়। অথচ হেগেলের তত্ত্বের ভেতরেই তিনি খুঁজে পেলেন সমাজবন্ধনের মূল কথাটি। পরম চিৎ-এর স্বয়ম প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায় হল পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সর্বোচ্চ পর্যায় হল তাত্ত্বিকবোধ। এই সমস্ত বিভিন্ন পর্যায় পরম-চিৎ-স্বরূপ পরম সত্তার স্বাধীনতার পরিস্ফুটন মাত্র। লৌকিক মানবসত্তার স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আসে না। পরন্তু পরমচিৎ-এর এই পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ দ্বান্দ্বিক নিয়মে হলেও তা কালিক নয়। কাজেই কোনো অবস্থাতেই পরিবার বা সমাজ বা রাষ্ট্রে কোনো মানুষ তার ব্যক্তিগত মর্যাদা পেতে পারে না। ইতিহাস ব্যাখ্যায় যদিও হেগেল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন তবুও দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে তিনি সময়ের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তর্কশাস্ত্রের প্রত্যয়ের মধ্যে আটকিয়ে রেখেছেন; ফলত দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সত্ত্বেও হেগেল ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ গতিকে অথবা সময়ের দিকটিকে অস্বীকার করেছেন। মার্কস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে দেখেছিলেন বস্তুর স্বরূপের অংশ হিসাবে। দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ বস্তুর স্বধর্ম। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের কথা মার্কসবাদী নন এমন বিশিষ্ট দার্শনিকেরাও স্বীকার করেছেন (যেমন স্যামুয়েল আলেকসান্দর)। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিও এই তত্ত্বের যাথার্থ্যকেই দৃঢ়তর করছে। এই পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণকে স্বীকার করতে হলে প্রথমত সময়কে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে হয় এবং দ্বন্দ্বমূলক বিকাশকে বস্তুজগতের স্বধর্মরূপে কল্পনা করতে হয় কারণ শুদ্ধ ভাবজগতে পরিমাণ ও গুণের পার্থক্য অলীক। কাজেই হেগেল সমাজবন্ধনের বস্তুগত শর্তাবলীকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপকে বিক্ষিপ্ত করেছেন। অথচ হেগেলের এই তত্ত্বেই সমাজতত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট ধারণাটি খুঁজে পান লেখক। আমরা আশ্চর্য হই এই দেখে যে লেখক ইতিহাস-সম্পর্কিত ক্রোচের মতবাদ আবেগদীপ্ত ভাষায় গ্রহণ করে বসে আছেন গ্রন্থের আরম্ভেই। আবার লেখক বিশেষ এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদকে হেগেলীয় তত্ত্বে প্রতিফলিত

করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। এবং এ ভাববাদ তাঁর মতে ভারতীয় ভাববাদ।

সমাজ সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা বলতে লেখক একটি বিশেষ ভাববাদী-তত্ত্বকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় ভাববাদে সমাজ সম্পর্কে ধারণাটি যে ঠিক কি তা তিনি বলেন নি। সমাজ-সম্পর্কিত ভারতীয় ভাববাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি কেবল চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের উল্লেখ করেছেন। বর্ণাশ্রমের ধারণা দ্বারা আমরা শুধু এটুকুই বুঝতে পারি যে সমাজে কতগুলি সম্পর্কের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হচ্ছে। এই সম্পর্কগুলির স্বরূপ নির্ণয় এবং তাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সাহায্যেই সমাজ-সম্পর্কিত ধারণা পরিস্ফুট হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীবসু এ ধরনের ব্যাখ্যাকে পরিহার করেছেন। ফলত সমাজ-সম্পর্কিত ভারতীয় ধারণার আসল কথাগুলিই তিনি বলেন নি। তাছাড়া ভাববাদী চিন্তাবিদেরা বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করেছেন—এর মানেই এই বোঝায় না যে বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করা মানেই ভাববাদকে স্বীকার করা। ভাববাদকে বর্জন করেও বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ লেখক করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় না কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কোনো ভাববাদী সমাজতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া 'গীতা'য় বর্ণাশ্রমের কথা বলা হলেও অনেক জায়গায় সেখানে পরমচিৎবাদের পরিপন্থী কথাও বলা হয়েছে। অনেকের মতে গীতার 'পুরুষোত্তম' এবং উপনিষদের 'পরমসত্তা'-রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন। কাজেই সমাজ-সম্পর্কিত ভারতীয় ভাববাদের বিশেষ কোনো তত্ত্ব যদি লেখক যথার্থ বলে মনে করে থাকেন তবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর দেওয়া উচিত ছিল। এই কারণে 'সমাজ'-সম্পর্কিত তাঁর সমস্ত আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

তিন

'স্বাধীনতা' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখকের মূল বক্তব্য হল: "ধর্ম-পরিমণ্ডলে যুক্তি-নির্ভর আত্মদর্শনের কথাই স্বাধীনতার কথা।" এ বক্তব্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে লেখক স্বাধীনতা-বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন এবং তত্ত্বগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(১) কান্টীয় তত্ত্ব (২) গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক বক্তব্য (৩) মার্কসীয় বক্তব্য (৪) প্লেটো-এরিস্টটেলীয় বক্তব্য ও

(৫) ভারতীয় বক্তব্য। কোন সূত্র অনুসারে 'স্বাধীনতা' সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে উল্লিখিত পাঁচটি ভাগে লেখক ভাগ করেছেন—তা বুঝতে পারা যায় না। এ-ভাবে ভাগ করার ফলে একটি তত্ত্বের ভিতর আরেকটি তত্ত্বের বক্তব্য সহজেই এসে পড়েছে এবং এই তত্ত্বগুলির আলোচনা তাঁর মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট না করে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। মার্কসীয় বক্তব্যের অংশে বক্তব্য বিষয়টিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারলেও এই অংশের বক্তব্যই সবথেকে বেশি অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

মার্কসের বিরুদ্ধে লেখকের প্রধান আপত্তি মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—তা আমাদের সত্যের সন্ধান দেয় না। তার কারণ "ব্যক্তির প্রথম চেতনাই তার আত্মবোধে অর্থাৎ তার চারপাশের বস্তুর অভিজ্ঞানে যাকে সে 'আমার' বলে দাবি করতে পারে।" কিন্তু লেখকের এই উক্তি কোন বিচারে আমরা মেনে নিতে পারি? বরং ব্যক্তির প্রথম চেতনাতে এ ধরনের কোনো 'আমার' বোধ তো দূরের কথা কোনো নির্দিষ্ট আমি বোধ থাকে কিনা সন্দেহ। লেখকের মতে "মার্কসের দ্বিতীয় প্রধান ভুল এই যে তিনি ব্যক্তিকে ব্যক্তি হবার দার্শনিক তত্ত্ব দিচ্ছেন না কিন্তু বলছেন সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বাধীনতা এসে যাবে।" কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব মার্কস ব্যক্তিকে দেন নি এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। মার্কসের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (সামাজিক) মানুষের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ বোঝায় যা শ্রেণীহীন সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজে সম্ভব নয়। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং শ্রেণীহীন সমাজের স্বা সেগুলির পার্থক্য কি মার্কস তা যথেষ্ট বিশদ এবং স্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়েছেন। শ্রেণীহীন সমাজে স্বাধীনতার রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন "সমাজ তখন হবে বস্তুর সংগঠন।" একথার অর্থ শ্রীবসু করলেন সমাজ হবে তখন একটি নিতান্তই যান্ত্রিক কাঠামো। শ্রীবসু ভুলে গেছেন যে মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে চলে না—চলে দ্বান্দ্বিক নিয়মে। তাছাড়া সমাজকে বস্তুর সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করার প্রকৃত অর্থ হল এই বস্তুজগতের বাহ্যশর্তাবলীগুলি ছাড়া সমাজের ওপর কোনো বাহ্য নি থাকবে না। আর একথা গণতন্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবসু নিজেই স্বী করেছেন। তাঁর মতে, "মানুষ একদিকে যেমন জড় তেমনি পশুও।

তার স্বাধীনতা বাকি দুটি স্তরকে মেনেই।" মার্কসীয় বক্তব্য আলোচনার শেষ করবার সময়ে লেখক মার্কসবাদ-এর সঙ্গে সঙ্গে মিলের উপযোগিতাবাদ ও ডিয়ুইর করণবাদকেও বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন। লেখকের মতে এ তিনটি তত্ত্বই অভিন্ন। তত্ত্ব তিনটি কোন এক অর্থে অভিন্ন। কারণ তিনটি তত্ত্বেই ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ হেতু জ্ঞানকে এবং লৌকিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। তত্ত্বগুলির যে দিকটি বলিষ্ঠ—সেই দিকটি বিবেচনা করেই লেখক তাদের বর্জন করতে বলছেন!

'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে লেখকের চরম বক্তব্য হল: "ধর্মপরিমণ্ডলে বৃত্তি-নির্ভর আত্মদর্শনের কথাই স্বাধীনতার কথা।" এ বক্তব্যটিকেই তিনি ভারতীয় বক্তব্যের নির্গলিতার্থ বলে বোঝাতে চেয়েছেন। স্বভাবের পরিণতির লক্ষ্যে পৌছনোর প্রচেষ্টাই হল স্বাধীনতার প্রকাশ, এ বক্তব্য ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রকাশ পেয়েছে এবং ভারতীয় বক্তব্য এই কারণেই গ্রহণীয়। একথার প্রামাণ্যের উপস্থাপনের জন্য লেখক বিস্তৃত আলোচনা করলেও বক্তব্যটি বিন্দুমাত্রও সরল হয় নি। প্রথম কথা, "ধর্মপরিমণ্ডলে বৃত্তি-নির্ভর আত্মদর্শনের কথাই স্বাধীনতার কথা"—এই বক্তব্যটি যে কোনো মতবাদের বক্তব্যেই থাকতে পারে। কারণ, 'ধর্মপরিমণ্ডল' অথবা 'আত্মদর্শন' শব্দগুলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন মতবাদীরা বিভিন্ন ভাবে দেবেন। 'ব্যক্তির স্বভাব' প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা বলা চলে। ভারতীয় বক্তব্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা লেখক বলতে চেয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য কিনা এ প্রশ্নের আগে সেই বৈশিষ্ট্যটিকে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা দরকার। লেখক এ কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।

"স্বাধীনতা" শব্দটি বিভিন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত করা যায়। যদিও সেই বিভিন্ন অর্থগুলির ভেতরে একটি প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বর্তমান থাকে "স্বাধীনতা"-সম্পর্কীয় বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনার সময়ে বিভিন্ন অর্থ এবং আলোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন না থাকলে উক্ত তত্ত্বগুলির প্রতি অবিচার করা হবে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক "স্বাধীনতার" বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে আলোচনার্থ গ্রহণ করার সময়ে একথা বিস্মৃত হয়েছেন। যে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির অবতারণা তিনি করেছেন সেগুলি মূলত একটি অপরটি থেকে পৃথক কিনা অথবা প্রতিটি তত্ত্বেই "স্বাধীনতা"র আলোচনা কোন পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে—একথাগুলি ভেবে দেখলে তিনি তাঁর বক্তব্যকে অনেক সুস্পষ্ট করতে পারতেন।

চার

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "এই গ্রন্থের তাত্ত্বিক আলোচনা সমাজ, স্বাধীনতা ও শিল্প বিষয়ে।" কিন্তু শেষ অধ্যায় পর্যন্ত পৌছনোর পর প্রশ্ন ওঠে—কিছু আলোচনা করা হয়েছে দেখলাম—কিন্তু আলোচনা কি তাত্ত্বিক? তাত্ত্বিক আলোচনার যথার্থ লক্ষণ কি এ কথা আমার অবশ্য নির্দি ভাবে জানা নেই, কিন্তু যে-আলোচনা পরস্পর-বিরোধী এবং অস্পষ্ট বক্তব্য বোঝাই তাকে নিশ্চয়ই তাত্ত্বিক আলোচনা বলা যায় না।

লেখকের মতে "আমাদের জীবন নেই, শিল্প আমাদের নিয়ে নয়।" "শিল্পী প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে ব্যস্ত নন, শিল্পী খোঁজেন না-জানা কথাগুলোই।" অথচ "সমাজব্যবস্থায় তাঁর (শিল্পীর) সত্তা একক, নিঃসঙ্গ, তিনি যেন দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে দ্রষ্টা বা ঋষির মতো, দৈনন্দিনে সম্পর্ক গড়ছেন না" গণতান্ত্রিকের এই মতকেও তিনি অস্বীকার করছেন। অপরদিকে লেখক নিঃসংশয়ে ঘোষণা করছেন, "যেহেতু মার্কসবাদের স্বাধীনতা-তত্ত্ব নেই, তার শিল্পতত্ত্বও থাকতে পারে না এবং নেইও।" মার্কসবাদে স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আগেই বলেছি। শিল্প সম্বন্ধেও ঐ কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। মার্কসবাদকে গ্রহণ না করলেও তিনি যদি নিষ্ঠা সহকারে মার্কসবাদের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকগুলির প্রতি মনোনিবেশ করতেন তাহলে বিষ্ণু দের বক্তব্যকে মার্কসবাদের বিরোধী বলে মনে হত না।

শিল্প সম্পর্কে বক্তব্যের সবশেষে লেখক বলছেন, "আসলে শিল্পের প্রক্রিয়া বারবার ফিরে আসতে হয় মানুষের স্বাধীনতায়, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী জীবনে উৎস, ভাববাদীর সত্যে ও ভারতবর্ষের ব্রহ্মে।" এ বক্তব্য থেকে নিহিতার্থ অনুধাবন করা খুবই দুঃসাধ্য। কারণ 'ভারতবর্ষের ব্রহ্ম' বস্তুটি কি তা আমার জানা নেই। লেখক যদি উপনিষৎ-কথিত 'ব্রহ্মে'র কথা বলতে চেয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয় যে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদগুলিতে এই 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভারতীয় চিন্তাধারায় যে সমস্ত ভাববাদী তত্ত্বের পরিচয় আমরা পাই সেগুলিতেও 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে বিরোধী বক্তব্য আছে। 'স্বাধীনতা', 'সমাজ' অথবা 'শিল্প' সম্পর্কে যদি কোনোরকম ভাববাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য কিনা সে প্রশ্নের আগে তত্ত্বটি-র নির্দিষ্ট এবং সরল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যে-হেতু এই দ্বিতীয় বিষয়ে লেখক আমাদের হতাশ করেন, তাঁর মূল বক্তব্য (যা 'ভাববাদের' কোনো এক বিশেষরূপ) কতখানি যুক্তিসিদ্ধ সে প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লৌকিক জিজ্ঞাসা

আকাঙ্খার উচ্চারণে অগ্রজের সশব্দ অধিকারী হয়েও সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির সক্রিয়তা উচ্চসংস্কৃতির তুলনায় নীরব। অষ্টাদশ শতকে সুইডিস সংস্কৃতিবিদ লিনিয়াসই[১] সম্ভবত প্রথম সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন। তথাপি বলা যায় সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট শাখা হিসাবে লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ইংলণ্ডে 'ফোকলোর সোসাইটি'[২] স্থাপনের পূর্বে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নি। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে ব্যক্তির একক পরিপ্রেক্ষিতহীন সামাজিক ঐক্যের সম্বন্ধপাতের সচলতায় সংস্কৃতির লোকায়ত ধারা মননচর্চার ইতিহাসে পূর্ণতার সন্ধানে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তার প্রাথমিক প্রস্তাবনা, ফোকলোর সোসাইটি আয়োজিত তিনটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং ফোকসঙ্ সোসাইটি ও ফোকডান্স সোসাইটি সংস্থাপনে; এবং তার পরিণত প্রচেষ্টার সংহত প্রকাশ, লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির সামগ্রিক অভিধান রচনায়।[৩]

'স্ট্যানডার্ড ডিকসেনারী অব ফোকলোর' গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতির এনসাইক্লোপিডিয়া বিশেষ। ক্রমিক বর্ণবিন্যাসে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাপক সম্ভারে, বিশেষজ্ঞদের রচনায় বিভিন্ন দেশের লোক-কৃষ্টির পরিচয় ও বিচার বিশ্লেষণে গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল। এই গ্রন্থ পৃথিবীর লোকসংস্কৃতি পরিক্রমার মাধ্যমে পৃথিবীর দেব-দেবী, লোকনেতা, যাদুকর; পশুপক্ষী, উদ্ভিদ, পোকামাকড়, গ্রহ-সম্পর্কিত লোককথা; লোকনৃত্য ও সঙ্গীত; উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠান; খাদ্যরীতি ও তার তাৎপর্য;

(১) *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends* (Vol—1+2): Editor in chief—Maria Leach. Funk & Wagnalls Company, New York.

(২) **বাংলার লোকসাহিত্য** প্রথম খণ্ড: আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ড: ছড়া ঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ক্যালকাটা বুক হাউস।

৭

খেলা, ছড়া, ধাধা, প্রবাদ, অলৌকিক শক্তি, ভবিষ্যৎবক্তা, ডাইনি, যাদুরহস্য, অতীন্দ্রিয় লোকবিশ্বাস-বিষয়ক দৈত্য-রাক্ষস-পরীর কথা এবং বিভিন্ন আদিম ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ ইত্যাদির বিচিত্র সম্ভার উপস্থিত করেছে। তথ্য ও তত্ত্বের দ্বৈত সম্পর্কে প্রতিটি অধ্যায় কমবেশি জিজ্ঞাসু মনস্কতার স্বাক্ষর বহন করে।

সংজ্ঞা-সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে বিশেষজ্ঞদের চব্বিশটি মতামত লোকসংস্কৃতির আত্মজিজ্ঞাসাকে মননে সুন্যস্ত করেছে। পরস্পর-বিরুদ্ধ মতামতে যথাযথ গুরুত্বে উপস্থিত করায় পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও নিজস্ব মতামত গঠনে একপেশে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করা সুযোগ থেকেছে। ঐতিহ্য-নির্ভর লিথুয়ানিয়ার লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞের মতে ব্যাপকতায় লোকবিজ্ঞানের সমগ্র রূপটি উপস্থিত করেছে: "Folklore comprises traditional creations of peoples, primitive and civilized. These are achieved by using sounds and words in metric form and prose, and include also folk beliefs or superstitions, customs and performances, dances and plays".[৩]

ব্যক্তি ও সমষ্টির ভূমিকা নির্দেশে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ জর্জ এন. ফস্টার-এর পাশাপাশি থিয়ডর এইচ. গেস্টর-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য: "Folklore is the part of a people's culture which is preserved, consciously or unconsciously, in beliefs and practices, customs and observances of general currency; in myths, legends and tales of common acceptance; and in arts and crafts which express the temper and genius of a group rather than of an individual."[৪]

লোকসাহিত্যের উদ্ভব ইতিহাসে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আপেক্ষিক সম্পর্কে মতটি আরো সম্প্রসারিত করে ম্যাগ এডওয়ার্ড লিচ বলেছেন যে সমস্ত লোক-কথার মৌল উৎসকেন্দ্র ব্যক্তিপ্রতিভায় সংস্থাপিত থাকলেও, পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া ও মৌখিক ধারার বিবর্তনে স্বাক্ষরহীন শিল্পসৃষ্টি সমবেত উৎকর্ষে ও স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করে। জর্মান লোকসংস্কৃতির আলোচনা সম্পর্কে ফ্রান্সিস পটার-এর প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত উক্তিটি লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়: "Folklore comprises things, acts, beliefs,

words, and lyric, didactic, or narrative themes transmitted and shaped by tradition."[৫]

লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা লোকগীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় লিখিত সাহিত্যের বহিঃপ্রাঙ্গনে জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য ও সুর সাধনার বিচিত্র প্রকাশ রূপে লোকগীতিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নগর সভ্যতার দূরে লোকায়ত ঐতিহ্যে মৌখিক ধারায় পরিস্ফুট লোকসঙ্গীত, লোকসাধারণের জীবনাচার ও আকাঙ্খার প্রতিফলনে সোচ্চার। লোকসঙ্গীতের বিভাগগুলি তত্ত্বগত ভাবে সুর, পাঠ, কথা ও সুরের সম্পর্ক, গীতরীতি, ধ্বনিতরঙ্গ, সঙ্গীতের প্রচার, যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, ঐক্যতানের বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভক্ত। বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ আলোচনা করে লোকসঙ্গীতে পঙ্‌ক্তি বিশেষের পৌনপুনিক বিন্যাসের litarary form ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং লোকসঙ্গীত শিক্ষার লোকায়ত পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "There is usually no technique of teaching, certainly no formal technique, connected with the making and singing of folk songs; they are learned by ear, and transmitted in this fashion from generation to generation."[৬]

প্রবাদ ও ধাঁধা, শিল্প ও জীবনের পারস্পরিক অন্বয়ে অভিজ্ঞতাবিধৃত লোকজ্ঞানের বংশানুক্রমিক বাহন। প্রবাদের জন্মসূত্র রহস্যাবৃত। সাধারণত ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণে সামাজিক জ্ঞানের প্রকাশ লোকঐতিহ্যে স্বীকৃত হয়েই প্রবাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। অপর পক্ষে ধাঁধাকে লোকজ্ঞান-সাপেক্ষ 'thought provoking question' বলা যায়। লোকায়ত জ্ঞানের প্রচলিত উত্তরটি প্রত্যাশিত হলেও ধাঁধার মধ্যে জনসমাজের জিজ্ঞাসুমনস্কতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ হিসাবে ধাঁধা ও প্রবাদের বিস্তৃত আলোচনা শেষ পর্যন্ত উৎস সন্ধানে সমোক্তার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

আদিম সমাজের যাদুবিশ্বাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পটভূমিকায় লোকনৃত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লোকনৃত্য-সম্পর্কিত অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোষ্ঠী ও ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্খায় উচ্চকিত লৌকিক যাদুবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সক্রিয় প্রতিভাস রূপে লোকনৃত্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে: "Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's council cycles.

Its true magic-religions function concerns preservation of the individual and the race."[৮]

লোকসংস্কৃতি অভিধান গ্রন্থে লোকশিল্পের সমগ্র ইতিহাসটি সবিশেষ উল্লেখিত হয়েছে। রেখাগত ছন্দে লোকশিল্পে জীবনার্থের অমোঘ আকর্ষণ ব্যক্ত। সভ্যতার আদিম অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক, জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনতৃষ্ণা, দৈনন্দিন উপযোগী বস্তু প্রস্তুতের সক্রিয়তা, অস্থ- বাসস্থান বহুবিধ প্রয়োজন ও সৃষ্টিনিপুণতার অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় লোকশিল্পকলার বিস্তার। প্রকৃতিকে বশ করার প্রচেষ্টা ও যাদু প্রক্রিয়া লোকশিল্পের উৎসরূপে সতত সক্রিয় ছিল। আদিম শিল্পের উদ্ভব ইতিহাসে নিরক্ষরতার পরিপূরকতা সন্ধান, পরস্পর সংযোগ প্রচেষ্টা, গণনা ও স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনকে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা প্রাধান্য না পেলেও, motif Index ও type Index এই পাশ্চাত্য রীতি দুটি এ গ্রন্থে সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। motif সম্পর্কে বলা হয়েছে : In folklore the term used to designate any one of the parts in to which an item of Folklore can be analyzed.[১০] লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে মটিফ নির্দেশিত হলেও লোককাহিনী অর্থাৎ কথা, গীতিকা, পুরাকাহিনী, বীরকাহিনী ইত্যাদির মধ্যেই মটিফের সবিশেষ অনুশীলন হয়েছে। কাহিনীর মটিফ সাধারণত অত্যন্ত সরল অথচ লোককথায় সতত-দৃষ্ট বস্তুনিচয়ে নিবদ্ধ থাকলেও তা নিতান্ত সাধারণ বস্তুর উর্ধ্বে। যেমন সাধারণ অর্থে 'মা' কোনো মটিফ নয়, কিন্তু 'নিষ্ঠুরা মা' ব্যতিক্রমের সূত্রে ফোক-মটিফ। মটিফ অন্বেষায় নিমগ্ন হলে বিশ্ব লোকসাহিত্যের মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্রটি সহজে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এবং এই সাধারণ ঐক্যের সূত্রে লোককথায় বিশিষ্ট 'টাইপে'র উদ্ভব। ব্যতিক্রম ও ঐক্যের বিভাগে লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণে মটিফ ও টাইপ পরস্পর সাপেক্ষ—In the latter, type and motif are identical.[১১]

লোকসংস্কৃতি অনুশীলন পদ্ধতি, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ বিশ্লেষণ ও নানাবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপনার সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্ব লোকসংস্কৃতির পর্যালোচনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিগ্রো, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, বাস্ক, কেলটিস্ক, ভারতীয়, ফিনিশ, ফরাসী, ইন্দো-পারসিয়ান, ইন্দোনেশীয়,

জাপান, স্পেন, শ্লাভিক, পলিনেশিয় প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির ব্যাপক রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে। লোককথা, প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি ও লোকায়ত জীবনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর লোকঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার স্বরূপ উদ্ঘাটন এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির পরিচয় প্রদর্শনে ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনা পরিবেশনে দেশবিশেষের প্রকাশবৈশিষ্ট্যকে যথাযথ অনূদিত করা হয়েছে।

লোকসাহিত্য অভিধানে প্রাচ্য লোকঐতিহ্যের আলোচনা পাশ্চাত্যের তুলনায় নেপথ্যচারী। তন্মধ্যে ভারতীয় শাখা[১২] নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। সম্ভবত ইওরোপীয় ভাষায় অনুবাদের অভাবই এর মৌল কারণ। এ দেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা হয়েছে তাও দেশীয় ভাষার সীমায় একান্ত আবদ্ধ। আন্তর্জাতিক গবেষণায় সহায়তার জন্য সুসমৃদ্ধ ভারতীয় তথা বাংলার লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক এবং সেইগুলির রসগ্রাহী টীকাসহ অনুবাদ প্রকাশও একান্ত প্রয়োজন। জার্মান লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর হান্শ্ মোদে সম্প্রতি ভারতীয় ও বিশেষ করে বাংলার লোকসাহিত্যের অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১৩] আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় উপাদানের ভাষান্তরের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করলেও, লোক-উপকরণগুলির যথাযথ সংগ্রহ ও সংরক্ষণই সম্ভবত আজকের প্রধান কাজ। কেননা শিল্পপ্রধান নগর সভ্যতার চঞ্চল আঘাতে বাংলার সংস্কৃতি ব্যাপকরূপে লোকজীবন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গ্রাম বাংলার কেন্দ্রাভিমুখী সংহতি ও কৃষিসংস্কৃতির গাঢ়বদ্ধতা আজ বিস্রস্ত। নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদে লোকসংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ত বিকাশ ব্যহত এবং নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে। এই পরিস্থিতির প্রধান কাজ দ্রুত ক্ষীয়মান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেশ ও জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অকৃত্রিম উপকরণ ও লোককৃষ্টির নিদর্শন-গুলিকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা। এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ করেই একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পেয়ে এসেছে তারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হয়ে যায় না। একমাত্র এগুলির মাধ্যমেই স্বদেশের সঙ্গে পরিচয়কে অন্তরঙ্গ করা সম্ভব।[১৪] এগুলিকে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করে

রাখার কর্তব্য বিষয়ে সম্ভবত কারো মতান্তর থাকতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।[১৫]

প্রেরণা ও প্রয়াসের বৃত্তে লোকসংস্কৃতিতে যে জাতীয় মানসের পরিচয় তার সহৃদয় সান্নিধ্য সন্ধান নিতান্ত সাম্প্রতিক। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট ঔৎসুক্যের ধারায় মননচর্চার ইতিহাসে দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গ্রিয়রসন, হাইমেনডর্ফে, আর্চার, এলউইন প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতদের অবদানও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সমসাময়িক কালে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতির সবিশেষ বিচার-বিশ্লেষণে, সমোচ্চার্থ নামগুলি সম্ভবত ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

আজন্ম অনুরাগে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল যাবৎ লোকসাহিত্যের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করলেও, সামগ্রিকভাবে তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য'[১৬] রচনার নেপথ্য ইতিহাস শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্যমেলার প্রেরণা। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলার (১৯৫৩) লোকসাহিত্য শাখায় 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিবেশী উপজাতির দান' সম্পর্কিত ভাষণ ও সেই সূত্রে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একখানি আনুপূর্বিক লোকসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনার পরামর্শ ও অনুরোধ ডঃ ভট্টাচার্যকে বাংলার লোকসাহিত্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। তাছাড়া ভেরিয়র এলউইনের গবেষণা-সহযোগিরূপে ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপক গবেষণামূলক কর্মপ্রচেষ্টাও লেখকের বর্তমান গ্রন্থ রচনায় অন্যতম নেপথ্য প্রেরণা।[১৭]

গ্রন্থ রচনায় পশ্চাৎপট অনুধাবনে, প্রেরণা ও প্রয়াসে, লেখকের যে নিষ্ঠা ও সক্রিয়তার পরিচয়, গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তার বিস্তৃত স্বাক্ষর বিদ্যমান। বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলের উপকরণ সংগ্রহ, সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এবং লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের তাত্ত্বিক আলোচনায় আলোচ্য গ্রন্থ সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিরূপে লোকসাহিত্যকে চিহ্নিত করে লেখক লোকসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমষ্টির ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতদের বিভিন্ন মত বিশ্লেষণ করে লেখক শেষ পর্যন্ত লোকসাহিত্যকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি বলে সিদ্ধান্ত করে বলেছেন যে, ব্যষ্টির মনে যে সকল অপরিণত ভাবের উদয়, তাই সমষ্টি লোকসাহিত্যরূপে সমাজকে পরিবেশন করে এবং বহির্মুখী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যেই লোকসাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে।[১৮] প্রসঙ্গত ডঃ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উভয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপমায় লোকসাহিত্যকে বৃক্ষের মূল ও উচ্চসাহিত্যকে ঐ বৃক্ষের ফুল-ফল-ডাল-পালা রূপে বর্ণনা করেছেন। লেখক লোকসাহিত্যকে কেবলমাত্র উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপেই বর্ণনা করেন নি সেই সঙ্গে উভয়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশে মন্তব্য করে বলেছেন যে লিখিত সাহিত্য অপরিবর্তনীয় ও কালের ছাপে সুনির্দিষ্ট তাই তার প্রাচীন (classic) হবার সম্ভাবনা, বিপরীতক্রমে লোকসাহিত্যে মৌখিক ধারায় সতত সবল ও অক্ষুণ্ণ সজীবতায় সমুজ্জ্বল। তাই তা প্রাচীনতার সম্ভাবনারহিত।

বাংলার লোকসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যকে লেখক ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা—রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা ও পর্যালোচনাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেছেন। বিষয় বিন্যাসের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। ডঃ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য গবেষণায় সংখ্যাতাত্ত্বিক পাশ্চাত্যরীতির (Motif Index ও Type Index) কৃত্রিমতা এবং রসবিচারের অতিরোমান্টিকতা পরিহার করে যৌথ জীবনাচারে সংহত সমাজসংস্কৃতির মৌল পটভূমিকায় রসানুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাযুজ্য সাধন করেছেন।

রূপকথা, পুরাকাহিনী, ইতিকথা, গীতিকা, উপকথা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে ডঃ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসাহিত্যে মানব স্বীকৃতির স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন। বাংলার লোকসাহিত্যে কল্পজগৎ ও বাস্তব জগতের পাশাপাশি অবস্থান বিস্ময়কর। ইওরোপীয় লোকসাহিত্যে কল্পজগতের সুখ সম্পদের পূর্ণতা যেমন ভাবে বাস্তব জগতকে বিদূরিত করে ভারতীয় তথা বাংলার লোকসাহিত্য সেইরকম করে না, এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস লোকায়ত আকাঙ্খায় রূপায়িত এবং কল্পজগৎ ও পার্থিবজগৎ লোকঐতিহ্যের প্রভাবে সাযুজ্যের স্বাক্ষর বহ করে।

লোকসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা 'গীতি' প্রসঙ্গে আলোচনাটি

বাংলা লোকসংগীতের বিপুল বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে। আঞ্চলিক গীতির মধ্যে—পটুয়া-ভাদু-ঝুমুর (পঃ বঙ্গ), জারি-ঘাটু (পূঃ বঙ্গ) গম্ভীরা-জাগ-ভাওয়াইয়া ; কর্মসঙ্গীতের মধ্যে—চাষীর গান, গোরু চরানোর গান, পাটকাটা, ধানভানা, সারি প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক গীতির মধ্যে গাজন-ভাদালি-উমাসঙ্গীত প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এ-গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। গীতি অংশে ডঃ ভট্টাচার্য বারমাসী বা বারমাস্যা গীতের উৎস সম্পর্কে মৌলিক মতামত উপস্থিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ঋতু সংগীতের বিবর্তনে বারমাস্যার উদ্ভব এই প্রচলিত মত খণ্ডন করে তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে লৌকিক গাঁথা গীতিকার ধারাতেই, পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকায় বিরহিনী নারীর সূক্ষ্ম মন-বিশ্লেষণধর্মী বারমাস্যা গীতের উদ্ভব ও বিকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে দুশান জাভিতেলও তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন—

Actually there are morerasons to attribute a folk-origin to the Bengali Baromasi than to presume a direct influence of Sanskrit poetry...the baromasi originated in folk poetry; that owing to its intrinsic attractiveness and its great popularity in Bengal, it found a place again and again in the classic literature.[১৯]

এই গ্রন্থে বহুবিধ উপমা ইত্যাদির প্রয়োগে—ব্রতর মধ্যে যাদুবিশ্বাস ও আদিম কল্যাণচেতনা, ধাঁধার মধ্যে আদিম দৈহিক সংগ্রামের কথার সংগ্রামে রূপান্তর ও তার বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের মধ্যে জাতির সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তির আভাষ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে, গবেষক লেখক বিভিন্ন অধ্যায়ে লোকায়ত জীবন ভাবনার বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন।

তথ্য সমাবেশ ও তাত্ত্বিক আলোচনায় বিভিন্ন অধ্যায়ে পুনরুক্তি থাকলেও তা সামগ্রিক আলোচনার পরিপূরক রূপেই প্রতিভাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গবেষণামূলক এই গ্রন্থে গবেষণার ঘ্রাণ অবশ্যম্ভাবী হলেও রসাবেদনের সুরটি কখনো সঙ্গতিহীন হয় নি। প্রত্নসম্পদ ও জীবন সম্পদ অনুসন্ধানে এই গ্রন্থের মৌলিক পরিচয় নিহিত। তাই সংখ্যাগত যান্ত্রিকতা বা ভাবালুতার অতিরেকে লেখকের চিন্তা তাড়িত নয়। ক্ষেত্র বিশেষে গ্রন্থকারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ

করেও সামগ্রিক ভাবে এই গ্রন্থের বিবেকী মননে পরিতৃপ্ত হওয়া কারো পক্ষেই অসম্ভব নয়। বিবেকি-মনন ও প্রত্যয়-সুনির্দিষ্টতার জন্যই গ্রন্থকার সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য' অধ্যায়ে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের ত্রুটিগুলিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। রসবিচারের আধিক্যে লোকসাহিত্য অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথের মননে যে সমাজবিজ্ঞানগত দিকটি আচ্ছন্ন তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। বিশেষ করে সংগ্রহ কর্মে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিবর্তে আদর্শবাদী মনোভাবের অভিব্যক্তি-জনিত ত্রুটির কথা তিনি সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। তাই 'বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন' ছড়াটির একস্থানে শব্দ পরিবর্তন প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে দেখিয়েছেন কেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ যথাযথ উপকরণ সংগ্রহে দ্বিধা ও স্বীয় নীতিবোধের দ্বারা সংশোধন বা পরিবর্তন করে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সর্বোপরি 'কবিসংগীত'কে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার ত্রুটিকে লেখক নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য গ্রন্থকার প্রক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র উপরোক্ত ত্রুটিরই উল্লেখ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ও তার সামাজিক পরিমণ্ডলটি উপস্থিত করেছেন এবং সামগ্রিক বিচারে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের মহৎ সূচনায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যরীতির তুলনামূলক ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপন্ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যুক্তি হয় না যে বাংলা ছড়ায় প্রথম সংগ্রাহক ও বিদগ্ধ সমালোচক, আজীবন লোকসাহিত্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছড়া খণ্ডটির সমর্পণ তাৎপর্যপূর্ণ। এদেশে ছড়ার সংগ্রহ বা তার প্রকাশ যখন প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য বলে বিবেচিত হত[২০] সেই সময়ে ছড়াসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান যে ব্যর্থ হয় নি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে তার বিবিধ নিদর্শন বর্তমান। বিশেষত্ব ও প্রকৃতি আটটি অধ্যায়ে যথাক্রমে ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, সেঝা, কন্থা, পরিবার, প্রাকৃত জগৎ, অতিপ্রাকৃত প্রভৃতি বিষয়ে ছড়াগুলিকে বিশ্লিষ্ট করা হয়েছে এবং যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে বিচিত্র সংগ্রহ উদ্ধৃত হয়েছে। বাঙলা ছড়ার এতবড় সম্ভার এর পূর্বে কোনোদিন প্রকাশিত হয় নি। তুলনামূলক সাহিত্যের বিচারে লেখক ছড়া সমেত বাঙলার লোকসাহিত্যের সর্বত্র প্রচুর বিদেশী উপমা-উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং প্রসঙ্গত বাংলার লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন।

বাংলার লোকসাহিত্যের অনুশীলনের ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু গবেষণামূলক এই গ্রন্থের মনন সমৃদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' ও বাঙলার লোকসাহিত্য' আলোচনাটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও যে অনুভূত না হয় তা নয়। তবে এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের দাবী আমরা নিবেদন করতে পারি।

বাংলার তথা ভারতীয় লোকসংস্কৃতির যে দুটি মৌলিক গুণ আন্তর্জাতিক গবেষণায় সর্বজনস্বীকৃত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার বিপুল প্রাণশক্তি।[২১] বাংলার লোকসাহিত্যের এই অমর প্রাণশক্তি তথা সদা সচলতায় বিশ্বাস ডঃ ভট্টাচার্যের গবেষণার অন্যতম ফলশ্রুতি। তাঁর বিশ্বাস গ্রাম্য জীবনের কৃষিভিত্তিক সংহতি শিল্প সভ্যতার আঘাতে ভেঙে গেলেও নগরকেন্দ্রিক সমাজেও অদূর ভবিষ্যতে সংহতি নতুন রূপরেখায় গড়ে উঠবে। তাই তিনি বিবর্তনের ধারায় মর্মবস্তু ও রূপাঙ্গিকের বিশ্লেষণে লিখিত সাহিত্যের সর্বাধুনিকতায় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ধাঁধা ও ছড়ার আলোচনায় লৌকিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের অনুগামীরূপে সাহিত্যিক ধাঁধা ও সাহিত্যিক ছড়ার পর্যালোচনা করেন।[২২]

মুমূর্ষু লোককৃষ্টি ও জীর্ণ ভদ্রসংস্কৃতির বৈষম্যকে, সামাজিক সত্তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশের পটভূমিকায়, জনসংস্কৃতিতে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা আজ বিশ্বজনীন ঘটনা। এই ঘটনার মনন বিধৃত রূপেই এদেশে বহুমুখী জীবন সত্যের সন্দর্শনে সংস্কৃতির লোকায়তিক চর্চা। ডঃ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্যের দুই খণ্ডের প্রকাশ সমেত ছয় খণ্ডের প্রতিশ্রুতি বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার সাম্প্রতিক ইতিহাসে ব্যাপক সম্ভাবনা সম্প্রসারিত করলেও, সজীব অথচ ক্রমক্ষীয়মান, সুস্থ অথচ বিকৃতি লোকসাহিত্য সংস্কৃতির গবেষণা-চর্চার ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞানের সামগ্রিক অন্বেষায় আজো পরিণতির পূর্ণতা প্রত্যাশী।

---

(১) Linnaeus, 1707—78
(২) ফোকলোর সোসাইটি ১৮৭৮
(৩) ইন্টারন্যাশনাল ফোকলোর কংগ্রেস ১৮৮৯—৯৩
ফোক্ সঙ্ সোসাইটি ১৮৯৮

ফোক্ ডান্স সোসাইটি ১৯১১
Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend
(৪) Standard Dictionary of Folklore Vol. 1 Page 398
(৫) Ibid Vol. 1 Page 399
(৬) Ibid Vol. 1 Germanic Folklore Page 445
(৭) Ibid Vol. 2 Song : folk song and the music of folk song—Herzog Page 1044
(৮) Ibid Dance : folk and Primitive Vol. 1 Page 276
(৯) Ibid Primitive and folk art Vol. 2 Page 887
tremendous demand placed upon the graphic and plastic arts in a non-literate society, as a means of communication, record-keeping, and calculating; for as soon as early man desired to communicate to some one not present (beyond the range of gesture and speech), pictures and symbols became necessary and a whole range of art forms sprang into existence.
(১০) Ibid Vol. 2 Motif Page 753
(১১) Ibid Vol. 2 Type Page 1137
(১২) Ibid Vol. 1 Indian and Parsian Folklore and Mythology Page 517
(১৩) ডক্টর হাইন্‌শ্‌ মোদে, শারদীয় স্বাধীনতা ১৩৬৮ পৃঃ ১৪
(১৪) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত "মেয়েলি ব্রত"-এর ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৫) লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৬) বাংলার লোকসাহিত্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
(১৭) ঐ প্রথম সংস্করণের নিবেদন
(১৮) সংহত সমাজ ও লোকসাহিত্য পৃঃ ৭
(১৯) The Development of the Baromasi and the Bengali Literature, Dusan Zavitel. Folklore / April 1962 / 160
(২০) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খুকুমণির ছড়ার ভূমিকা
বাংলার লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, ছড়া পরিশিষ্ট
(২১) If we are constantly surprised by a strange mixture of the familiar and miraculous in Indian Folklore, we are equally surprised by its vitality...
Marian W. Smith.—Indian and Persian Folklore and Mythology Page 517.
(২২) ঐ প্রথম খণ্ড ধাঁধা : লৌকিক ও সাহিত্যিক পৃঃ ৫৩০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড অষ্টম অধ্যায় সাহিত্যিক ছড়া পৃঃ ৬৫২

শঙ্খ ঘোষ

ভারতচর্চা

'বিকেলবেলা ত্রিবেদী মহাশয়ের ঘরে অধ্যাপকদের আড্ডা জমত কৃষ্ণকমলবাবুকে ঘিরে। সেখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা হতো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। এমন আলোচনা আর কোথাও আমি অন্তত শুনি নি।' এ-অভিজ্ঞতা ধূর্জটিপ্রসাদের, যখন তিনি রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই হয়তো শেষ যুগ, তার পর থেকে ধীরে ধীরে চিন্তার জগতে শ্রমবিভাগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বাঙলা যে প্রবন্ধসম্ভারের শুরু হয়েছিল অক্ষয়কুমারের বিচিত্র জিজ্ঞাসায়, তার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই শতাব্দীর শেষার্ধে। কিন্তু আজকের দিনে আমরা বিশেষ-বিষয়ের পাণ্ডিত্যে প্রখর মনীষীদের নাম যদি-বা করতে পারি, এমন উদাহরণের উচ্চারণ নিতান্ত কঠিন হয়ে পড়ে যাঁর মধ্যে চিন্তার সেই সর্বৈব অন্বেষা প্রবল, যে-আলোচনাচক্রে 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, পুরাতন ইতিহাসে'র একত্র-চর্চা সম্ভব।

উপরন্তু সংস্কৃতশিক্ষা এখন প্রায় অপাংক্তেয়। আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের মধ্যে লুটোপুটি করে, অথবা সংস্কৃতির উৎস অন্বেষণে আজ আমরা বারংবার উনবিংশ শতকের মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু বিস্ময় সেই শতাব্দী তাকিয়ে ছিল সমগ্র প্রাচীন ভারতের দিকে এবং 'বর্তমানকে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় অতীতকে জানা' এই বিশ্বাসে সমগ্র অতীতের মন্থন সম্ভব হয়েছিল ইংরেজিশিক্ষিত আধুনিকদের চর্চায়। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ-অনুবাদ ছিল সেই বিরাট প্রাণস্পন্দনের এক বহিঃপ্রকাশ। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যার রচয়িতা রমেশচন্দ্রের আড়ালে তাঁর ঐ পরিচয় আজ প্রচ্ছন্ন। বঙ্গদর্শন, প্রচার এবং নবজীবনে তখন বঙ্কিম, অক্ষয় সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র—এঁদের সমবেত [illegible]

ঋগ্বেদ-সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] সম্পাদিত সংস্করণ, জ্ঞানভারতী।

মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের যে নবীন জাগরণ, তা ছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। শশধর তর্কচূড়ামণির হাস্যজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুয়ানি এ নয়, এর মূল্য ছিল মুক্তদৃষ্টির।

বাঙলাদেশে বেদচর্চার অভাব প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের দু'এক বছর পরেই তিনি চতুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য চতুর্ব্রাহ্মণকে কাশীতে পাঠান, রমানাথ ভট্টাচার্য তার অন্যতম। তত্ত্ববোধিনীতে ঋগ্বেদের অনুবাদও প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁরই রচিত, এবং রমানাথ সরস্বতীও সেকাজে খানিকটা এগিয়েছিলেন। এর কোনোটিই সম্পূর্ণ হতে পারে নি। ফলে 'ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্যজাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব?'—রমেশচন্দ্রের এই আক্ষেপোক্তি স্বাভাবিক মনে হয়। এ-অনুবাদের কাজে তিনি স্বয়ং যখন আকৃষ্ট হয়েছেন সে-সময়ের মধ্যে মরাঠি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় তার কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই আংশিক অনুবাদগুলি এবং ইয়োরোপীয় বেদজ্ঞদের সমকালীন ধারণাবলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কতদূর পর্যন্ত তাঁর নিষ্ঠা ছিল তা বুঝতে পারি চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লক্ষ্য করলে। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রকাশিত গ্রাসমান এবং লুড্‌ভিক্‌-এর জার্মান দুটি সম্পূর্ণ অনুবাদের সংবাদও রাখতেন তিনি এবং এর মধ্যে অন্তত একখানি তিনি সংগ্রহ করেও নিয়েছিলেন। লাঁগ্লোয়ার ফরাসি অনুবাদ, ম্যাক্সমুলার, উইলসন, রট্, মুর, কাওয়েল, বেন্‌ফে, রোসেন, হেক্সটারগার্দ—এঁদের সকলের আলোচনা বা আংশিক অনুবাদ আয়ত্তে ছিল তাঁর। ফলে রমেশচন্দ্র যখন ঋগ্বেদ অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন, মানসিক দিক থেকে তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

একথা ঠিক যে সায়ণের টীকাই তাঁর মূল অবলম্বন এবং রামগতি ন্যায়রত্ন বা বঙ্কিম অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করেছেন এই দেখে যে রমেশচন্দ্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ সায়ণনির্ভর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত হবে যে এই তৃপ্তি রমেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। বঙ্কিমের উক্তিমতো রমেশচন্দ্র যে 'সর্বত্র'ই সায়ণ মেনে নিয়েছেন তা হয়তো সত্যি নয়। পাদটীকায় যোজিত তাঁর দীর্ঘ মন্তব্য ও তুলনামূলক আলোচনাগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব, প্রয়োজনমতো সায়ণের ব্যাখ্যা ও শব্দটীকা অগ্রাহ্য করতে আধুনিক এই অনুবাদক কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। যে-তীব্রতায় বঙ্কিম ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ

ইয়োরোপীয় ভারতজ্ঞদের আক্রমণ করেছেন (যেমন তাঁর হেনোথীজম্-তত্ত্ব প্রসঙ্গে) রমেশচন্দ্র ঠিক সে জাতীয় বিমুখতায় কখনোই তাঁদের সরিয়ে দেননি— এক হিসেবে এ হয়তো তাঁর ঔদার্যই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং সায়ণ-নির্দেশিত ঐতিহ্যনির্ভরতা, এ দুয়ের যে মধ্যপন্থাসমন্বয় পরবর্তীকালে ক্রমে গড়ে উঠেছে—রমেশচন্দ্র অস্পষ্টভাবে তারই অভিমুখী ছিলেন, এই রকম মনে হয়।

উনিশশতকের শেষ দুই দশক ভারতচর্চার এক গৌরবময় কাল। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ প্রকাশিত হবার কিছু আগে থেকেই বঙ্কিম 'প্রচারে' বেদবিষয়ক প্রবন্ধরচনায় আগ্রহী হন এবং পর পর তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সেখানে আমরা পাচ্ছি। রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদে উল্লসিত হয়ে ওঠা বঙ্কিমের পক্ষে তাই স্বাভাবিক ছিল। অনুবাদকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন: "যেমন বাইবেলের অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এদেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে।" পুরোহিত সম্প্রদায়ের খড়্গহস্ত হয়ে ওঠার যে-উল্লেখ বঙ্কিম করেছেন তা স্বাভাবিক, বিশেষত রমেশচন্দ্র অব্রাহ্মণ, তবে সে-উত্তেজনা তো শতাব্দী সূচনায় রামমোহনের শাস্ত্রচর্চা থেকেই অনুসৃত! কিন্তু এ-অনুবাদ জাতীয় চিত্তে বাইবেলের মতো প্রভাব বিস্তার করবে, এ হয়তো বঙ্কিমের অতি-আশা। অন্তত সাধারণ পাঠকচিত্তের সঙ্গে এর কোনো ধারাবাহিক সংযোগ রচিত হতে পারে নি। আধুনিক ভারতে, বিশেষত বাঙলায়, বেদচর্চার পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে? গত বৎসর দিল্লীতে সর্বভারতীয় বেদজ্ঞদের এক সম্মেলন পরম হতাশার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চার এই ক্ষীয়মাণতা লক্ষ্য করেছিল এবং একে রোধ করবার জন্য কয়েকটি কৃত্রিম অনুশাসনের প্রস্তাব নিয়েছে। রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদগ্রন্থ আজ যদি প্রায় অপরিচিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে উপরোক্ত অবস্থার সঙ্গে তা নিতান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নিছক ভারতচর্চার দিক থেকে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদকর্মটি স্মরণীয়। কিন্তু তার সঙ্গে আবার লক্ষ্য করি এর শিল্পগুণ। অনুবাদক তাঁর ভূমিকায় ঋগ্বেদের ধর্মচিন্তাকে মাত্র প্রশ্রয় দেন নি, 'প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ' সুন্দর সরল মন্ত্রগুলির উল্লেখ করেছেন। এই আলোকবিভা রমেশচন্দ্র কী কৌশলে তাঁর অনুবাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন!

সমকালীন দু'একটি অনুবাদ-অংশের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে হয়তো

এই শিল্পগুরুত্ব আমরা বুঝতে পারব। ভাষাসম্রাট বঙ্কিমের একটি রচনাংশ: "অগ্নি পূর্বঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন"। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক ঐ অংশের রমেশচন্দ্রকৃত অনুবাদ: "অগ্নি পূর্বঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।" শ্রী ও স্বাভাবিকতায় পরবর্তীটি পূর্বতনকে কি অতিক্রম করে নি? অথবা, রমানাথ সরস্বতীর একটি শ্লোকানুবাদ: "অবিশ্রান্ত প্রবহণশীল নদী সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জলসমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।" এর সঙ্গে রমেশচন্দ্র: "স্থিতিরহিত, বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিহিত, নামশূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘনিদ্রায় পতিত রহিয়াছে।" এ-অনুবাদ স্বাভাবিকের চেয়ে আরো একটু বেশি, যথার্থ পাঠে-এর অন্তঃপ্রবাহী ছন্দঃস্রোত পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, এই অনতিগোচর ছন্দই তাঁর অনুবাদকে কাব্যবিভান্বিত করে তুলেছিল।

দুই

মূল্যবান এই অনুবাদগ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য, এমন-কী, সাধারণের অগোচর। তাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তীর সম্পাদনায় এর পুনঃপ্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় স্বভাবত গবেষক। বিশেষত গত কয়েক বছর যে Indian Studies সম্পাদনা করছেন তিনি, তার মধ্য থেকে তাঁর অতীত-সন্ধানী মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা কঠিন নয় যে আলোচ্য সংস্করণটির পরিকল্পনাও তাঁর মনে এসেছে ঐ অতীত সূত্রের আলোচনাক্রমে। Indian Studies-এর খণ্ডগুলির মধ্যে একাধিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ যেমন সম্ভব হয়েছে, রমেশচন্দ্রের এ অনুবাদটিও তেমনি একই মনোভঙ্গি থেকে সকলের হাতে পৌছে দিতে চেয়েছেন তিনি। সাধারণ পাঠক এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

এক অর্থে, একে অবশ্য মাত্র-পুনর্মুদ্রণ বলা চলে না। রমেশচন্দ্রের অনুবাদ অংশকে সম্পূর্ণ যথাযথ রেখেও এখানে অপরবিধ কয়েকটি পরিবর্ধন করা হয়েছে।

সম্পাদকের ভাষায় : "রমেশচন্দ্রের অনুবাদ গদ্যে বলেই সূক্তগুলিকে গদ্যাকারে মুদ্রিত করায় বাধা হয় নি। সূক্তের অন্তর্ভুক্ত প্রতি ঋকের 'শেষে' ঋক্‌সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে সেই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শেষ ঋক্ মণ্ডল বিভাগ অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রতি সূক্তের শীর্ষে দেবতা, ঋষি ও ছন্দ বিশেষভাবে সংযোজিত হয়েছে।"

শেষ উল্লেখটি সবচেয়ে লক্ষণীয়। বঙ্কিম তাঁর আলোচনায় লিখেছিলেন: "...প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উহার একটি হেডিং আছে। আগে হেডিংটি উদ্ধৃত করি। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।" এই হেডিং-এর মধ্যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ পাই, ঋষি বা কবির নাম, উদ্দিষ্ট দেবতার নাম, ছন্দ-নাম এবং প্রয়োগ-নাম। রমেশচন্দ্রের অনুবাদে প্রতিটি সূক্তের সঙ্গে ঋষিনাম ও দেবতানাম দেওয়া আছে, কিন্তু ছন্দ ও বিনিয়োগ বর্জিত। বিনিয়োগগুলি প্রায়ই আরোপিত ও কষ্টকল্পিত বলে তার বর্জন হয়তো সমীচীন, সাম্প্রতিক সংস্করণেও তার ব্যবহার নেই। কিন্তু ছন্দনাম রমেশচন্দ্র কেন বর্জন করলেন? দেবীপ্রসাদ অনুমান করেন, অনুবাদ গদ্যে বলেই তিনি ছন্দের কথা ভাবেন নি। তা সম্ভব। কিন্তু ঋকগুলির পূর্ণ পরিচয়ের জন্য ছন্দ-নাম যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল, সম্পাদকেরা তা বুঝেছেন।

সবচেয়ে শ্রমসাধ্য সম্পাদকীয় কাজ হলো সূক্তশীর্ষে ঋষি ও দেব-নামের পূর্ণতাদানে। ঋগ্বেদের একেকটি সূক্তে একাধিক দেব উদ্দিষ্ট এবং একাধিক ঋষির দ্বারা স্তুত, এমন উদাহরণ সুলভ। রমেশচন্দ্র তাঁর কাজ খানিকটা সহজ করে নিয়েছিলেন। সূক্তে প্রথমোক্ত দেব বা ঋষির নামই তিনি ব্যবহার করেছেন। বর্তমান সম্পাদনায়, ঋক্‌সংখ্যা উল্লেখ করে বিভিন্ন দেবতা, ঋষি ও ছন্দের নাম প্রতি সূক্তশীর্ষে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কাজ যে কতো দুরূহ, দু'একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। ১/১৩ সূক্তে বারোটি ঋক্-এ বারোজন দেবতা উল্লিখিত, ৬/৭৫ সূক্তে উনিশটি ঋকে তেইশজন দেবতা। ৫/৪৪ সূক্তে পনেরোটি ঋক্, ঋষি সংখ্যা তেরো। ১/১২০ সূক্তে বারোটি ঋক্, ন-রকম ছন্দ, ৮/৪৬ সূক্তে তেত্রিশটি ঋক্-এ দশ রকম ছন্দ এবং আরো উপবিভাগ। সমগ্র ঋগ্বেদের ১০২৮টি সূক্তকে এইভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা কী পরিশ্রমের, তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

বেদপাঠের পরিচায়িকা হিসেবে সম্পাদকীয় ভূমিকাটি পরিচ্ছন্ন এবং উপযোগী। চব্বিশ পৃষ্ঠার এই সংহত রচনাটির মধ্যে 'সাধারণ পাঠকের বেদপরিচিতি'র প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। বেদ ও বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদসংহিতা, বৈদিকছন্দ, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা, অথর্ববেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, বেদাঙ্গ, বেদের কালনির্ণয় এই দশটি অংশে ভূমিকাটি লিখিত। বেদের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে সম্পাদক স্বয়ং কোনো আলোচনা করেন নি, কেননা এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমারের দীর্ঘ একটি আলোচনা এখানে গৃহীত। কিন্তু জ্ঞাতব্য তথ্যাবলীতে অন্যান্য বিভাগগুলি সমৃদ্ধ। ঋগ্বেদপরিচয় অংশে সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠের বিশ্লেষণ বস্তুতই আধুনিক পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং ছন্দ-প্রসঙ্গের আলোচনাও বিশেষ লক্ষণীয়। অল্প পরিসরে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে মিলিয়ে নিয়ে এ-জাতীয় আলোচনা খুব সুলভ নয়, এদিক থেকে এই ভূমিকাটি মূল্যবান।

আরো কয়েকটি রচনা ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিকসাহিত্য, তার কালপরিচয় এবং বেদচর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে দীর্ঘ একটি আলোচনা করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে পরিচায়িকা লিখেছেন। প্রবোধরাম চক্রবর্তী একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর। এছাড়া, বৈদিক ভারতের একটি মানচিত্র সঙ্গে যুক্ত থাকায় সম্পাদকীয় আয়োজন পরিপূর্ণ হয়েছে বলা যায়।

বৈদিকযুগ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রকালীন ধারণাবলীর আরো অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বা সর্বপ্রাচীনত্ব নিয়ে যে গর্ববোধ উনিশ শতকে আমরা অবিরাম দেখেছি এখন তা অনেকটা অপসৃত হবার কথা। মিতান্নি আর্যভাষা বা হিট্টি ভাষার আবিষ্কারেই বৈদিকভাষার সর্বপ্রাচীনত্ব আর গ্রাহ্য হয় না। এরও ওপর, গত দশ বছরের মধ্যে দুজন ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীনতম গ্রীকভাষার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের। ফলে সে ভাষাকেই এখন প্রাচীনতম বলতে হবে। এই বিষয়টির উল্লেখ, বেদের কাল বিষয়ে বিস্তৃত মীমাংসা, ভাষা ছন্দ ও উচ্চারণের প্রসঙ্গ : সমস্ত নিয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের রচনাটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। ভাষাগত বিবর্তন দেখাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি লাইনের কাল্পনিক স্তরপরম্পরা লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য গুটি তাঁর প্রায় তিরিশ বছর পূর্বের রচনাংশ।

ডক্টর দাশগুপ্তের রচনাটির শেষদিকে একটি অন্যমনস্ক প্রয়োগ চোখে পড়ে। "সমস্ত মন্ত্রগুলির অর্থ একত্রিত করিয়া গোটা ঋক্‌টি অর্থবান্ হইয়া ওঠে"— স্বভাবতই, এখানে তিনি সূক্ত কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। প্রবোধরাম চক্রবর্তী-কৃত গ্রন্থপঞ্জীটির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করলে বোঝা যায় লেখক হিসেবে রমেশচন্দ্রের উৎসাহ কতোদিকে ব্যাপ্ত ছিল। দেশচেতনা ও ইতিহাসবোধ সেই উৎসাহের প্রধান অংশ, সমস্ত রচনাবলীর পটভূমিতেই ঐ বোধ প্রচ্ছন্ন। এই তালিকাটি প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলজনক তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ঋগ্বেদসংহিতার প্রকাশকাল লিখিত হয়েছে ১৮৮৫-৮৭। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো, ভিন্ন ভিন্ন বিন্যস্ত অষ্টকগুলির ভূমিকা-রচনাকাল মূলত ছিল এইরকম: ১ আশ্বিন ১২৯২, ১ মাঘ ১২৯২, ১ চৈত্র ১২৯২, ১ বৈশাখ ১২৯৩, 3rd May 1886, 11th May 1886, 20th May 1886, এবং 26th May 1886। একমাত্র অষ্টমখণ্ডটি ছাড়া সবকটির নামপত্রে ১৮৮ এবং ১৮৮৬ আছে। এই তারিখ লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি কী দ্রুততায় খণ্ডগুলি প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছে। আরো বিস্ময়ের বিষয়, শেষ চারটি খণ্ড মুদ্রণকালে অনুবাদক আছেন বিদেশগামী জাহাজে, সেখান থেকে বশিষ্ঠের একটি স্তব ব্যবহার করে লিখছেন: "সমুদ্রমধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছি, জলের উপর গমনশীল নৌকায় আছি, শোভার্থ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছি!"

তিন

বৃহৎ এই অনুবাদ-গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করে সম্পাদকযুগল আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশেষকৌতূহলী কোনো কোনো ব্যক্তি এ সংস্করণে দু-একটি ঐতিহাসিক অভাব বোধ করতে পারেন। এর ভবিষ্যৎ কোনো মুদ্রণ যদি সম্ভব হয়, সম্পাদক আমাদের কয়েকটি বিনীত প্রস্তাব কি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন?

বর্তমান মুদ্রণে সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়েছে রমেশচন্দ্রকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের ওপর। অনুবাদক স্বয়ং সেই সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন, তাই এর মূল্য আছে। কিন্তু আজ যখন ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ আমাদের হাতে পৌঁছল তখন তার আকর্ষণ হবে উভয়ত। বেদচর্চার স্বতন্ত্র মূল্য একদিকে, অন্যদিকে

রমেশচন্দ্রের সৃষ্টিকর্ম হিসেবেও এর তাৎপর্য লক্ষ্য করা আজ স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে অন্য দু-একটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই নিশ্চয় এ-সংকলন প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু উক্ত সংস্করণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে বর্জিত দেখতে পাচ্ছি।

১. প্রথম সংস্করণের যে ভূমিকাটি দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রথম অষ্টকের ভূমিকা মাত্র। আলোচ্য পুনর্মুদ্রণেও যে নামপত্র ছাপা হয়েছে তাতে সকলে দেখতে পাবেন, ওটি প্রথম অষ্টকের। প্রথম প্রকাশের সময়ে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন অষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিল। এইভাবে আটটি অষ্টকে আটটি ভূমিকা মূলে পাই। পরবর্তী ভূমিকাগুলি ছোটো। কিন্তু সম্পাদকেরা সেগুলি যদি পরিশিষ্টে যোগ করে দিতেন! এর ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। এমনকী, এমনিতে-খুব-সাধারণ ঐ ভূমিকাটিতে দু-একটি ভারি কৌতূহলপ্রদ খবর পাওয়া যাচ্ছে। যেমন একটি: "প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে লাংলোয়া-কৃত ফরাসি অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদসংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ আর কোনও ভাষায় নাই। ঋগ্বেদসংহিতা জার্মান ভাষায়ও সম্পূর্ণ অনুবাদিত হইয়াছে তাহা তখন আমি জানিতাম না। লড্‌উইগ্ এবং গ্রাসমান এই দুইজন জার্মান পণ্ডিত অনুমান দশ বৎসর হইল ঋগ্বেদসংহিতার দুইখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রচার করেন। তাঁরা উভয়েই সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়াই এই অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রাসমান-কৃত অনুবাদখানি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, লড্‌উইগ্-কৃত অনুবাদখানিও অচিরে সংগ্রহ করিবার অভিলাষ আছে।" এই ভূমিকাংশটুকুর মূল্য যে কতখানি তা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

২. রমেশচন্দ্রের যে-কৃতিত্বে আমাদের বিস্ময়, তা কেবল এই নয় যে কী অসীম ধৈর্যে এ-অনুবাদ তিনি করেছিলেন। ওরই সঙ্গে সঙ্গে যে পাদটীকা যোজনা করে গেছেন তিনি, তার আকর্ষণও কম নয়। সন্দেহ নেই যে রমেশচন্দ্রের পর আরো নতুন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এখন তাঁর অনেক উক্তি অব্যবহার্য বা নিষ্প্রয়োজন মনে হতে পারে। কিন্তু সেই কারণেই এ-টীকাগুলি বর্জিত হতে পারে না। কেননা ওর মধ্যে রমেশচন্দ্রের পঠন, পরিশ্রম, তুলনামূলক বিচার এবং ঔদার্যের যে পরিচয় ধৃত আছে তা অসামান্য। যেমন, একটি দীর্ঘ উদাহরণ নেওয়া যাক: ১।৭।৯

ঋকের টীকায়: "পঞ্চক্ষিতি অর্থ চারি জাতি ও নিষাদেরা সায়ণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন এইরূপ শব্দের সায়ণ ও যাস্ক অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, পাঠক তাহা সেই সেই স্থানে দেখিবেন। কোথাও পঞ্চজগৎ বা গন্ধর্বাদি পাঁচপ্রকার জীব অর্থ করিয়াছেন; ৮৯ সূক্তের ১০ ঋক্ ও ১০০ সূক্তের ১১ ঋক্ দেখ। সুতরাং সায়ণ পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুভব করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চারিজাতি ও নিষাদ—এরূপ অর্থ নহে, কেননা ঋগ্বেদরচনার প্রারম্ভে চারিজাতি ছিল না, কেবলমাত্র দুই জাতি ছিল, আর্য এবং অনার্য বা দস্যু। ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষে আর্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক বা পুরোহিত শ্রেণী, রাজপুরুষগণ ও সাধারণ শ্রমজীবী বা ব্যবসায়ী লোক এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়াছিল, কিন্তু তখনও এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিস্থ লোকদিগের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য নিষিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এ তিনটি শ্রেণী তিনটি জাতি হয় নাই। পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এইরূপ লিখিয়াছেন…" অতঃপর রমানাথ সরস্বতীর উদ্ধৃতি, মূর-এর Sanscrit Texts-এর উল্লেখ, ম্যাক্সমূলর ও ওয়েবারের বিস্তৃত মতামত! অথবা, এই ধরনের টীকা: "দ্বিতীয় অষ্টকে অসুর শব্দ দশবার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—" তার বিবরণ ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ! পরবর্তী বেদচর্চায় এর মূল্য যাই হোক, এ-সমস্ত টীকা রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারাকে বুঝতে নিশ্চয় বিশেষ সাহায্য করবে।

৩. প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছিলেন: "ঋগ্বেদ হইতে আর্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্তমান হিন্দুধর্ম কিরূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি এবং ঋগ্বেদের রচনার সময়ে আর্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার-ব্যবহার ছিল…সে বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে।" 'পুস্তক'রূপে এ-রচনা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু নবজীবন পত্রিকায় দীর্ঘ এক বৎসরব্যাপী প্রবন্ধে এ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র। 'ঋগ্বেদের দেবগণ' নামক সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি সাম্প্রতিক সংস্করণের মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হলে কেমন হতো? স্বরচিত সম্পাদকীয় ভূমিকাটি ছাড়াও আরো কয়েকটি লেখা এর অন্তর্গত হয়েছে বলেই এ-প্রশ্ন মনে উঠছে। এমন-কী, ঐতিহাসিক কৌতূহলের দিক থেকে বিচার করলে

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বেদ' নামক রচনাটিও এর একটি উপযুক্ত পাঠ-ভূমিকা হতো কিনা, বিবেচ্য।

৪. দেব- এবং ঋষি-নামের একটি অনুক্রমণিকায় এ-সংকলন হয়তো সমৃদ্ধতর হতো। এ-কাজ বিশেষ শ্রমসাধ্য, কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমরা তা দাবি করতে পারি। রমেশচন্দ্র একরকম আংশিক অনুক্রম অবশ্য রেখেছিলেন। দেবতা অথবা অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ, এই শিরোনামে ছোটো ছোটো কয়েকটি তালিকা তাঁর গ্রন্থান্তর্গত ছিল। সে তালিকাগুলি অনুবাদকের টীকা-প্রসঙ্গকে জড়িত করে নিয়ে, তাই তার থেকে সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া অবশ্য সম্পাদকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি কয়েকটি প্রস্তাব মাত্র, এর দ্বারা বর্তমান সংস্করণের গৌরব লঘু হয় না। আচার্য সুনীতিকুমার ভূমিকায় যে আশা প্রকাশ করেছেন, সেখানেই এর যথার্থ মূল্য: "এই নবীন সংস্করণ দ্বারা এখন বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী পাঠকের পক্ষে ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের মূল উৎস আলোচনা করিবার সুযোগ আবার আসিয়াছে।" এই সুযোগের ব্যবহার আমরা কতটা করতে পারব, তার ওপর নির্ভর করবে আমাদের ভবিষ্যৎ চরিত্রনির্মাণ। কিন্তু সেই সুযোগ যাঁরা রচনা করে দিলেন, তাঁরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রাম বসু

লোকসাহিত্যে বর্ষা

ফলিত সভ্যতা, অর্থাৎ যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রচার যত বাড়ছে এবং মানুষ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে যতই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ততই লোক-সংস্কৃতির ধারা ক্ষীণতর হচ্ছে। ক্ষীণতর ধারার সামনে দাঁড়িয়ে বিদেশের বহু শিল্পী বুঝেছিলেন যে লোক-শিল্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধুমাত্র অতীতের সাক্ষী হিসাবে নয়, মিউজিয়মের কোনো সামগ্রী মতো করে নয়, অত্যন্ত জীবন্তভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। নৃতত্ত্ব বিস্থার গৌরব হিসাবেও নয়; এই ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার আমাদের শিল্প-সাহিত্যের তাগিদে। বুদ্ধি-সর্বস্ব শিল্পচর্চা নিরক্ত রুগ্নতায় মৃতোন্মুখ হতে বাধ্য। লোক-সংস্কৃতির আদি প্রবাহ সেই সঞ্জীবনী যা জীবনের দিবাতৃষ্ণায় আমাদের প্রসন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ একভাবে এবং সাম্প্রতিক কালের বিষ্ণু দে অন্যভাবে সেই একই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ফোকলোর সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে সম্প্রতি। কিন্তু তার ব্যাপকতাও যেমন সীমাবদ্ধ, তীব্রতাও তেমন মৃদু। সরকারি শেতহস্তীর শোভা যতটা, কার্যকারিতা তার তুলনায় অনুল্লেখ্য। তবু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বহু প্রণম্য পণ্ডিত এদিকে কিছু অগ্রসর হয়েছেন এবং তা নিতান্ত আত্মিক প্রয়োজনে। তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত অনেকদিন ধরে লোক-কবিতা ও লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে কাজ করে আসছেন। এই বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কাছে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং তাঁর সম্পাদিত 'ফোকলোর' পত্রিকাটি পরিচয়ের প্রয়োজন রাখে না। সম্প্রতি 'রেন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড লোর' নামে একটা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এবং শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এই গ্রন্থটির সম্পাদক।

Rain in Indian Life and Lore : Sankar Sen Gupta. Indian Publications Calcutta-1. Board Bound Rs. 12. Cloth Bound Rs. 14.

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু এই ব্যাপক বিষয়কে যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে পরিবেশন করা দরকার ছিল তা সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি বলে মনে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-জীবনে বৃষ্টির রূপ পরিষ্কার করে তোলা হয় নি। বিভিন্ন উপজাতির জীবনে বৃষ্টির গুরুত্বও উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে নি। অথচ যখন দেখি লোক-জীবনের কথা বলতে গিয়ে সেই সব উপজাতির উল্লেখ প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে ইতঃস্তত ছড়ান তখন মন অতৃপ্ত থেকেই যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ওরাও, কোল, ভূমিজ, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির জীবনে বৃষ্টির 'ম্যাজিক' প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য; বৃষ্টি সম্পর্কিত যে গান তাদের আছে তা সাহিত্যিক সম্পদেও ঐশ্বর্যবান। ছত্রিশগড়ি লোক-কবিতা এই দিকে অতুলনীয়। সম্পাদক ও বিভিন্ন প্রবন্ধকার সে-সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবের জন্যই সম্ভবত তাঁরা আমাদের কাছে সেই ঐশ্বর্যের বিভা তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। মনে হয়, প্রদেশ বা রাজ্য হিসাবে নয়, উপজাতি হিসাবে যদি লোক-গীতি ও তাদের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করা হত তবে আমাদের মতো সাধারণ পাঠক আরও অনেক উপকৃত হতেন। অথচ যখন দেখি শ্রীধ্যানেশ চক্রবর্তী ও উষা চক্রবর্তী বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি স্বল্প পরিসরে চকিত পরিক্রমা করেন এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হতে হয়। অবশ্যই যেহেতু এই সংকলনটি ভারতীয় জীবনের প্রতি নিবেদিত সেহেতু বেদ, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সম্পূর্ণই যুক্তিগ্রাহ্য। এই যুক্তিকে স্বীকার করেও বলা যায় যে ব্যাপকতা এবং গভীরতার দিক থেকে দক্ষিণ ভারত কিছু কম না হলেও আলোচিত হয় না। অথবা জীবন বলতে গিয়ে কি ওই তিনটে বুড়ি ছুঁলেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়?

যা হয় নি তা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। শুধু এই অনুরোধ জানাই যে দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সম্পাদক যদি আমাদের মতো পাঠক, যারা এ বিষয়ে একেবারেই বিশেষজ্ঞ নন, তাদের প্রতি একটু লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করেন তবে ভারতীয় লোক-জীবনে বৃষ্টি কি গভীর ও তাৎপর্যময় স্থান অধিকার করে আছে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিন্তু যা হয়েছে তাও কোনো অংশে কম মূল্যবান নয়, বরং বলা যায় ভারতীয় লোক-জীবন আলোচনার ক্ষেত্রে এই সংকলনটি বার বার উল্লেখের দাবি রাখে। এটি একটি মূল্যবান সংযোজন এবং সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য।

সরকারী খয়রাত না পেয়ে এবং এই জাতীয় গ্রন্থে বৃহত্তর পাঠক সমাজের জোরালো অবহেলা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা এমন আয়োজন করতে পারেন তাঁরা যে এই বিষয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই জন্য তাঁরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে সম্পাদকের দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রবন্ধে, 'রেন ব্রিংগস লাভ' আলোচনার মনোহারিত্বে এবং লোকগীতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখের দিক দিয়ে খুবই মূল্যবান। আবার এই ব্যাপক বিষয়ে, বৃষ্টির সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক নিয়ে শ্রী চণ্ডি লাহিড়ীর দায়-সারা আলোচনা এবং অতি পরিচিত দুটি ছড়ার অকৃপণ ব্যবহার মনকে পীড়িত করে। আবার গুজরাটের জীবন নিয়ে শ্রী পুষ্কর চন্দাড়ভক যে তথ্যবহুল ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে লোকগীতির যে ব্যাপক ব্যবহার করেন তাতে যে কোনো পাঠক পুলকিত হবেন। এই রকম আর দুটি প্রবন্ধ হল সরোজিনী বাবর-এর মহারাষ্ট্র লোকগীতিতে বৃষ্টি এবং শ্রীগণেশ চৌবের বিহার সম্পর্কে আলোচনা। অল্প পরিসরে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন গারো অঞ্চল সম্পর্কে শিবনারায়ণ কবিরাজ এবং পাঞ্জাব সম্পর্কে সাবিত্রী সারিন।

কিন্তু এই সংকলনের দুর্বলতা হল অপেক্ষাকৃত তাত্ত্বিক আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় সমীর ঘোষালের ফোক কাল্ট এবং ম্যাজিক ক্রিয়াকাণ্ড কিংবা পরেশ দাশগুপ্তের বৃষ্টি বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা। বৃষ্টির সঙ্গে প্রেম, বিরহ মিলনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেই সম্পর্ক যে আছে রোপণের। এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে অবশ্য। যৌনতার সঙ্গে তার স্বীকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে উক্তিও আছে। কিন্তু তা নিতান্তই মামুলী ধরনের। শুধু এই বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ থাকা উচিত ছিল না কি? বাংলা দেশে অম্বুবাচী সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাও কি উল্লেখের দাবি রাখে না? মনে হয় এইসব অপেক্ষাকৃত তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য একটা অংশ রেখে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি যদি আরও যত্ন সহকারে আলোচিত হত তবে পাঠক সাধারণ আরও উপকৃত হতেন। তার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব দ্বিতীয় সংস্করণের এবং প্রথম সংস্করণের এই অতৃপ্ত আনন্দ নিয়ে থাকব সাময়িকভাবে।

বিয়োগপঞ্জী

সম্প্রতি গত এক মাসের মধ্যেই প্রায় অল্পদিনের ব্যবধানে বাংলার বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট কয়েকজনের তিরোধান আমাদের শোকাভিভূত করেছে।

জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য শিশিরকুমার মিত্র, রেডিও-ইলেকট্রনিক্স ও আয়োনোস্ফিয়ার সম্পর্কিত গবেষণা ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রেখে গেলেন। ধ্রুপদ-চর্চায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার স্থান সারা ভারতে বাংলার নিজস্ব অবদান। সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, পরিণত বয়সেও, তাই এই লোকান্তর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনার জগতকে বেদনার্ত করে গেছে। তাঁর সাধন-ধারা ছাত্রছাত্রী পরম্পরায় আর তৎপ্রণীত 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা'য় বিধৃত রয়ে গেল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু কল্লোলকালীন লেখক গোষ্ঠীর একজন শক্তিমান কথাকার, সাহিত্যানুবাদক ও হৃদয়বান শিল্পীকে হরণ করল। প্রবীণ বয়সে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান একজন সৎ, বিবেকবান সাহিত্যিকের স্থান শূন্য করল।

এরই সঙ্গে, তরুণতর বাঙালী কবিগোষ্ঠীর কাছে আঘাত হয়ে আসে তাঁদেরই সমবয়স্ক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি দিলীপকুমার সেনের আকস্মিক অকালমৃত্যু—বিশেষত শেষদিকে রচনায় তিনি যখন কাব্যাচর্চায় ক্রমশ পরিণত-মনস্কতার অন্বেষণ করছিলেন।

আরও সম্প্রতিও, ইংরেজ কবি লুই ম্যাকনীসের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। তিরিশের অডেন-স্পেণ্ডার-ডে-লুইসের সহযোগী এই আর একজন বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত কবি, ইংরেজী কবিতার সেই সময়ের কাব্যান্দোলনের তরঙ্গে যাঁর কবিকৃতি আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল।

এঁদের প্রত্যেকের প্রসঙ্গেই 'পরিচয়'-এর পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় যোগ্য আলোচনা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের রইল।

মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে

শারদীয় পরিচয়

১৩৭০

●

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের খসড়া
(হস্তাক্ষর সংবলিত)

মিছিলের শহর

নানা চোখে দেখা চেনা কলকাতার
অচেনা রূপ

মহানগর

সত্যজিৎ রায়-কৃত চিত্রনাট্যের অংশ
রেখাচিত্র সহ

মস্কোয় তিনটি দিন

মস্কো থেকে গোপাল হালদার প্রেরিত

●

সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ

(বিস্তারিত বিবরণ পরে বিজ্ঞাপিত হবে)

দাম : এক টাকা

